সমাজবিজ্ঞানীদের মতবাদ ও অবদান

Theories and Contribution of Sociologists

ইউনিট ৩

সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যতম প্রতিষ্ঠিত শাস্ত্র হচ্ছে সমাজবিজ্ঞান। আলোচ্য বিষয়, তত্ত্ব, পদ্ধতি, সাধারণীকরণ এবং বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার ভিত্তিতে সমাজবিজ্ঞান আজ সত্যিই অনেক পরিণত। কিন্তু শাস্ত্রটি এ অবস্থায় একদিনে আসেনি। সমাজতাত্ত্বিকদের দীর্ঘদিনের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় বিকশিত হয়ে সমাজবিজ্ঞান আজকের এ অবস্থায় উন্নীত হয়েছে। সমাজবিজ্ঞান উদ্ভবের মূলে একটি দীর্ঘ পটভূমি এবং অসংখ্য মনীষীর অবদান রয়েছে। সমাজবিজ্ঞান বিকাশেও রয়েছে বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিকের অবিস্মরণীয় অবদান। তাঁদের সমাজচিন্তা, গবেষণা, কালজয়ী তত্ত্ব ও মতবাদ সমাজবিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁদের অবদানেই সামাজিক বিজ্ঞানের একটি জনপ্রিয় শাখা হিসেবে সমাজবিজ্ঞান আজ পরিণত, প্রতিষ্ঠিত। অগাস্ট কোঁৎ সমাজবিজ্ঞানের জনক। কিন্তু ইবনে খালদুন, হার্বার্ট স্পেন্সার, কার্ল মার্কস, ম্যাক্স ওয়েবার, এমিল ডুর্খেইম সমাজবিজ্ঞানের একেকজন স্থপতি। বস্তুত তাঁরাই সমাজবিজ্ঞানের পথিকৃৎ। তাদের হাত ধরেই সমাজবিজ্ঞান আজকের এই শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে। এ ইউনিটে সমাজবিজ্ঞানের কয়েকজন প্রথিতযশা সমাজতাত্ত্বিকের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৭ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৩.১ : অগ্রপথিক সমাজবিজ্ঞানীদের মতবাদ ও অবদান
পাঠ-৩.২ : ইবনে খালদুন
পাঠ-৩.৩ : অগাস্ট কোঁৎ
পাঠ-৩.৪ : হার্বার্ট স্পেন্সার
পাঠ-৩.৫ : এমিল ডুর্খেইম
পাঠ-৩.৬ : কার্ল মার্কস
পাঠ-৩.৭ : ম্যাক্স ওয়েবার

পাঠ-৩.১ অগ্রপথিক সমাজবিজ্ঞানীদের মতবাদ ও অবদান
Theories and Contribution of the Pioneer Sociologists

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- অগ্রপথিক সমাজবিজ্ঞানীদের সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- সমাজবিজ্ঞানীদের মতবাদ সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা করতে পারবেন এবং
- সমাজবিজ্ঞানীদের অবদান বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	অগ্রপথিক সমাজবিজ্ঞানী, সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ, সমাজতাত্ত্বিক অবদান।

সমাজবিজ্ঞান এমন একটি বিজ্ঞান যা সামাজিক বিষয়ের সাধারণ অথবা বিশেষভাবে ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্কের বিজ্ঞান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। সমাজবিজ্ঞানকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে অধ্যয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে সমাজবিজ্ঞানীগণ অবদান রেখেছেন। তাঁদের সমাজতাত্ত্বিক চিন্তা ও দর্শন সমাজবিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছে। সমাজবিজ্ঞানের উদ্ভব ও বিকাশে যাঁদের অবদান সবেচেয়ে বেশি তাঁদের মধ্যে ইবনে খালদুন, অগাস্ট কোঁৎ, হার্বার্ট স্পেন্সার, এমিল ডুর্খেইম, কার্ল মার্কস, ম্যাক্স ওয়েবার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইবনে খালদুন সমাজের সঠিক ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে সমসাময়িক সমাজের সমাজ সংস্কৃতি রীতিনীতি সম্পর্কে জানার প্রয়োজন অনুভব করেন। এ জন্য তিনি সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কিত পাঠের প্রতি গুরুত্ব দেন। সমাজ সম্পর্কিত গ্রন্থ না পেয়ে নিজেই সমাজবিজ্ঞান রচনায় মনোযোগী হন যা সংস্কৃতির বিজ্ঞানের রূপ পরিগ্রহ করে। রাষ্ট্রের উত্থান পতনের সাথে সামাজিক সংহতি কিভাবে সম্পর্কিত তা আসাবিয়াহ প্রত্যয় দ্বারা প্রকাশ করেন। '*আল-মুকাদ্দিমা*' তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ।

সমাজবিজ্ঞানের জনক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন অগাষ্ট কোঁৎ। তিনি সমাজকে নিয়ে নতুন একটি বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন যা সমাজবিজ্ঞান বলে পরিচিত। তিনি মানব বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের তিনটি স্তরের কথা বলেন যা দ্বারা সমাজের তিনটি বিবর্তন ধারা প্রকাশ পায়। দৃষ্টবাদে যা কিছু সত্য, বাস্তব, পরীক্ষাযোগ্য তার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। বিজ্ঞানের সোপানক্রমে সমাজবিজ্ঞানকে সবার উপরে স্থান দিয়েছেন কারণ সমাজবিজ্ঞান একটি সমন্বিত বিজ্ঞান।

সমাজবিজ্ঞানী হার্বার্ট স্পেন্সার সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়নে পদার্থবিদ্যা এবং জীববিদ্যার সূত্র প্রয়োগের কথা বলেছেন। তাঁর মতে জীব জগতে যেমন বিবর্তন হয় তেমনি সমাজও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সহজ সরল অবস্থা থেকে ক্রমান্বয়ে জটিল অবস্থায় উপনীত হয়েছে। জৈবিক সাদৃশ্যবাদে সমাজকে জীবদেহের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, জীবদেহে যেমন বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কর্মক্ষম থেকে সচল থাকে তেমনি সমাজের বিভিন্ন দল, প্রতিষ্ঠান রয়েছে যা পারস্পরিক কর্মকাণ্ড ও মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজকে সচল রেখেছে।

এমিল ডুর্খেইম সমাজবিজ্ঞানকে সামাজিক ঘটনার বিজ্ঞান বলেছেন। সামাজিক ঘটনা বলতে তিনি কোনো জনগোষ্ঠীর সমষ্টিগত চিন্তা-চেতনা, প্রবণতা ও রীতি-নীতি প্রভৃতিকে বুঝিয়েছেন। সামাজিক ঘটনা সমাজের যৌথ প্রতিরূপের মাঝেই নিহিত। আত্মহত্যা বিষয়ক আলোচনায় তিনি মনস্তাত্ত্বিক, ভৌগোলিক প্রভৃতি কারণকে নাকচ করে সামাজিক কারণসমূহের উপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন। সামাজিক বন্ধনের মূলসূত্র আবিষ্কারের লক্ষ্যে তিনি সমাজে শ্রমবিভাজনের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। ডুর্খেইমের মতে, ধর্ম কেবল অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাসই নয় বরং এর সামাজিক গুরুত্ব রয়েছে। ধর্ম মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে এবং সামাজিক শৃঙ্খলায় ভূমিকা রাখে।

কার্ল মার্কস বস্তুবাদী সমাজচিন্তাবিদ হিসেবে পরিচিত। ঐতিহাসিক বস্তুবাদে তিনি সমাজ তথা ইতিহাসকে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করেছেন। উৎপাদন পদ্ধতিকে সমাজের মৌল কাঠামোর (Basic Structure) সঙ্গে তুলনা করেছেন যা উপরিকাঠামোকে (Super Structure) প্রভাবিত করে। সমাজের চালিকা শক্তি হিসেবে উৎপাদন পদ্ধতির গুরুত্ব আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, মানব সমাজের ইতিহাস হচ্ছে শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস। বিভিন্ন সমাজে শ্রেণি সংঘাত এবং

সংগ্রামের কারণেই নতুন সমাজ সৃষ্টি হয়। শ্রেণি সম্পর্কিত আলোচনায় তিনি শ্রেণি সংগ্রামের কারণ এবং এর নানাবিধ বিষয় তুলে ধরেছেন। পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিক শ্রেণি কিভাবে তাদের উৎপাদিত পণ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঐ সমাজেই বসবাস করে তা তার শ্রমের বিচ্ছিন্নতাবোধ সম্পর্কিত ধারণার মধ্যে পাওয়া যায়। শ্রমিক শ্রেণি তাঁর শ্রমের মাধ্যমে সৃষ্ট উদ্বৃত্ত মূল্য কিভাবে পুঁজিপতি শ্রেণি শোষণ করে তা উদ্ধৃত্ত মূল্য তত্ত্বে আলোচনা করেছেন।

সমাজবিজ্ঞানের নিজস্ব পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন ম্যাক্স ওয়েবার। তিনি আদর্শ নমুনার মতবাদে বলেছেন, কোনো বিষয়বস্তু একটি মানসিক চিত্র যার মাধ্যমে ঐ বিষয়বস্তুর বাস্তব দিকগুলো মূর্তমান হয়ে ওঠে। আমলাতান্ত্রিক ধারণায় তিনি একটি আদর্শ ধরনের আমলাতন্ত্রের কথা বলেছেন যা সামাজিক উন্নয়ন ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক। তাঁর মতে, ক্ষমতা হলো অন্যের মতামত তথা সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার সক্ষমতা। যখন তার বৈধতা থাকে তখন তাকে কর্তৃত্ব বলে। পুজিঁবাদ সম্পর্কিত আলোচনায় ম্যাক্স ওয়েবার কার্ল মার্কসের বিপরীত ধারণা প্রদান করেন। মার্কস যেখানে বলেছেন, সমাজের মৌল কাঠামো (Basic Structure) উপরি কাঠামোকে (Super Structure) প্রভাবিত করে ম্যাক্স ওয়েবার সেখানে বলেছেন, কেবলমাত্র মৌল কাঠামোই নয় বরং কখনও কখনও উপরিকাঠামোও মৌল কাঠামোকে প্রভাবিত করে। এ ক্ষেত্রে তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মীয় নীতিমালা পুজিঁবাদ বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, সমাজবিজ্ঞানীদের উপর্যুক্ত চিন্তা, অনুসন্ধান, গবেষণা, তত্ত্ব ও মতবাদ সমাজবিজ্ঞানের উদ্ভব ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	সমাজবিজ্ঞান উদ্ভব ও বিকাশে যেকোনো তিনজন মনীষীর তাত্ত্বিক অবদান লিখুন। **সময়: ১০ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

সমাজবিজ্ঞানের জনক অগাস্ট কোঁত ১৮৩৯ সালে সমাজবিজ্ঞানের যাত্রা শুরু করলেও এর বিকাশে অন্যান্য সমাজতাত্ত্বিকের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের মধ্যে ইবনে খালদুন, হার্বার্ট স্পেন্সার, এমিল ডুর্খেইম, কার্ল মার্কস, ম্যাক্স ওয়েবার উল্লেখযোগ্য। সমাজকে নিজস্ব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা তাঁদের রচনার মধ্য দিয়েই সবেচেয়ে বেশি দৃশ্যমান হয়েছে। ফলে সমাজবিজ্ঞান একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোন সমাজবিজ্ঞানী সমাজকে জীবদেহের সাথে তুলনা করেছেন?

(ক) ম্যাক্স ওয়েবার (খ) হার্বার্ট স্পেন্সার

(গ) কার্ল মার্কস (ঘ) এমিল ডুর্খেইম

২। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ধারণা কে প্রদান করেন?

(ক) ইবনে খালদুন (খ) ম্যাক্স ওয়েবার

(গ) কার্ল মার্কস (ঘ) অগাস্ট কোঁত

৩। আদর্শ নমুনা হলো-

(ক) মানুষের আচরণ (খ) পরিসংখ্যানিক গড়

(গ) সামাজিক সমস্যা (ঘ) একটি মানসিক চিত্র

পাঠ-৩.২ ইবনে খালদুন
Ibn Khaldun

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- ইবনে খালদুনের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- আসাবিয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন এবং
- সামজিক ইতিহাস রচনার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ইবনে খালদুন, আল-মুকাদ্দিমা, আসাবিয়া, ইতিহাসের দর্শন।

জীবন ও কর্ম

ইবনে খালদুন ১৩৩২ অব্দে উত্তর আফ্রিকার তিউনিস শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বংশানুক্রমে দক্ষিণ আরবের প্রসিদ্ধ কিন্দা গোত্রের অধিবাসী। খালদুনের পিতা একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি প্রাথমিক জীবনে কোরআন, কোরআন সম্পর্কিত বিজ্ঞান, হাদিস ও ধর্মীয় নিয়ম-কানুন অধ্যয়ন করেন। বাল্যকাল হতে তাঁর শাণিত বুদ্ধি ও দার্শনিক প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি তাঁর চিন্তা জগতের বিকাশ ঘটান ইতিহাস, দর্শন, গণিত অধিবিদ্যা, সমাজবিদ্যা প্রভৃতির মাধ্যমে। ১৪০৬ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ইবনে খালদুন রচনাসমগ্র 'কিতাব-আল-ইবর্' গ্রন্থটিকে 'পৃথিবীর ইতিহাস' বলা হয়। 'কিতাব-আল-ইবর্' তিনটি পুস্তকে মোট সাত খন্ডে বিভক্ত। প্রথম পুস্তকের নাম 'মুকাদ্দিমা' বা 'আল-মুকাদ্দিমা' যাকে ইতিহাসের ভূমিকা বলা হয়। দ্বিতীয় পুস্তকে সাংস্কৃতিক বিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করেন যা 'আল-উমরান' বলে পরিচিত। তৃতীয় পুস্তকে ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব থেকে তার সমসাময়িক সময় পর্যন্ত আরবের ইতিহাস বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন।

আল-মুকাদ্দিমার গুরুত্ব

ইবনে খালদুন তাঁর মূল্যবান অমর গ্রন্থ 'আল-মুকাদ্দিমার'য় ইতিহাসের দর্শন, রাষ্ট্রের উৎপত্তি, রাষ্ট্রের প্রকারভেদ, রাষ্ট্রের উত্থান-পতন, আসারিয়া বা গোষ্ঠী সংহতি বিষয়ে আলোচনা করেন। ইতিহাসের দর্শন আলোচনায় সঠিক ইতিহাস রচনার গুরুত্ব আলোচনা করেন। এ সময়ে ইতিহাসের ভ্রান্তিসমূহ কিভাবে সঠিক ইতিহাসের অন্তরায়ের রূপ পরিগ্রহ করে তা স্পষ্ট করেন। খালদুন সরকার ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে তিন ধরনের রাষ্ট্রের কথা বলেছেন। তা হলো প্রথমত: সিয়াসা দিনিয়া যা শরিয়া মোতাবেক পরিচালিত, দ্বিতীয়ত: সিয়াসা আকলিয়া যা মানবীয় কারণ দ্বারা পরিচালিত। তৃতীয়থ: সিয়াসা মাদানিয়া যা দার্শনিকদের মতামতের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত। রাষ্ট্রের উত্থান পতন সম্পর্কিত আলোচনায় একটি চক্রাকার তত্ত্ব প্রদান করেছেন যার মাধ্যমে আসাবিয়াহ বা সংহতির গুরুত্ব স্পষ্টভাবে আলোচনা করেছেন। রাষ্ট্র কিভাবে একটি শক্তিশালী আসাবিয়ার মধ্যদিয়ে গঠিত হয় এবং তা কিভাবে দুর্বল হয়ে পতন ঘটে তা আলোচনা করেছেন যা সামাজিক বাস্তবতা অনুধাবনে সহায়ক।

আসাবিয়া

সমাজচিন্তায় ইবনে খালদুনের আসাবিয়া (Asabiya) বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। আসাবিয়া প্রত্যয়টি সামাজিক সংহতির (Social Solidarity) সমার্থক বিবেচনা করা হয়। আসাবিয়া হচ্ছে একটি গোষ্ঠীগত উন্মাদনা ও সংহতি। এ সংহতির উপর ভিত্তি করে যেকোনো গোষ্ঠীর লোকেরা তাদের নিজেদের গোষ্ঠীকে রক্ষা করার জন্য অন্য গোষ্ঠীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সাধারণত এ ধরনের সংহতির মাধ্যমে প্রতিটি গোষ্ঠী নিজেদেরকে স্বয়ংসম্পন্ন ও চরম ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করে। বিভিন্ন উপায়ে আসাবিয়া তথা সামাজিক সংহতি প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। যেমন রক্তসম্পর্ক, ধর্ম, ঐতিহ্য তথা সংস্কৃতি, জ্ঞাতি সম্পর্ক, ভাষা, জাতীয়তা, শ্রমবিভাজন প্রভৃতি।

ইতিহাসের দর্শন

ইবনে খালদুন ইতিহাসকে একটি বিজ্ঞান হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন, কেবলমাত্র ঘটনার বর্ণনা হিসেবে নয়। তিনি সঠিক ইতিহাস রচনা করতে চেয়েছিলেন যা কারণিক ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। তাঁর এই ধারণা সামাজিক দর্শনের নতুন শাখা তৈরিতে সাহায্য করে। তাঁর মতে, ইতিহাস লেখার জন্য অসংখ্য মৌলিক উপাদান ও অপরিমিত জ্ঞানের দরকার। আরো দরকার চিন্তা প্রবণতা ও পরিপূর্ণ মানসিকতার। এ দুটি গুণের অধিকারী হলেই ঐতিহাসিক সত্যের সন্ধানে অগ্রসর হতে পারেন এবং ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি এড়াতে পারেন। ইবনে খালদুনের মতে ইতিহাস হচ্ছে পৃথিবীর সংস্কৃতি, সভ্যতা বিকাশের অমর কাহিনী, মানব সমাজের তথ্যাবলী এবং পৃথিবীর মানুষের যাবতীয় কার্যাবলীর বিবরণ।

ইবনে খালদুন সঠিক ইতিহাস রচনা করার জন্য ইতিহাসবিদকে ঐ সমাজের সংস্কৃতি সম্পর্কে বিস্তর জ্ঞান লাভের পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর মতে, ইতিহাসবিদ নিজে ঘটনার কারণ ও প্রকৃতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও যাচাইবাছাই করে সঠিক ইতিহাস রচনা করবেন।

	শিক্ষার্থীর কাজ	ইতিহাস চর্চায় ইবনে খালদুনের মতবাদ লিখুন	**সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

ইবনে খালদুন সমাজের সঠিক ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে ঐ সমাজের সমাজ সংস্কৃতি রীতিনীতি সম্পর্কে জানার প্রয়োজন অনুভব করেন। এ জন্য তিনি সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কিত পাঠের প্রতি গুরুত্ব দেন। সমাজ সম্পর্কিত গ্রন্থ না পেয়ে নিজেই সমাজবিজ্ঞান রচনায় মনোযোগী হন যা সংস্কৃতির বিজ্ঞানের রূপ পরিগ্রহ করে। রাষ্ট্রের উত্থান পতনের সাথে সামাজিক সংহতি কিভাবে সম্পর্কিত তা আসাবিয়াহ প্রত্যয় দ্বারা প্রকাশ করেন। আল-মুকাদ্দিমা তাঁর কালজয়ী গ্রন্থ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ইবনে খালদুন কত ধরনের রাষ্টের ধারণা দেন ?

(ক) দুই (খ) তিন

(গ) চার (ঘ) পাঁচ

২। 'আসাবিয়াহ' দ্বারা খালদুন কী বুঝিয়েছেন?

(ক) সামাজক নিয়ন্ত্রন (খ) সামাজীকীকরণ

(গ) সামাজিক সংহতি (ঘ) সামাজিক উন্নয়ন

৩। ইবনে খালদুনের মূল গ্রন্থের নাম কি?

(ক) কিতাব-উল-ইবর্ (খ) আল-উমরান

(গ) মুকাদ্দিমা (ঘ) রিপাবলিক

পাঠ-৩.৩ আগস্ট কোঁৎ
Auguste Comte

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- অগাস্ট কোঁৎ- এর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- অগাস্ট কোঁৎ- এর ত্রয়স্তরের মাধ্যমে বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের স্তর আলোচনা করতে পারবেন;
- দৃষ্টবাদের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- বিজ্ঞানের সোপানক্রম বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	অগাস্ট কোঁৎ, ত্রয়স্তর সূত্র, দৃষ্টবাদ, বিজ্ঞানের সোপানক্রম।

জীবন ও কর্ম

আগাস্ট কোঁৎ সমাজবিজ্ঞানের জনক বলে পরিচিত। তিনি ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের মন্টপেলিয়ারে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই কোঁৎ প্রখর স্বরণশক্তি এবং বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ছিলেন। ১৬ বছর বয়সে ইকলে পলিটেকনিক নামক স্কুলে যোগ দেন। পরবর্তীতে তিনি প্যারিসে চলে যান। ১৮৫৭ সালে অগাস্ট কোঁৎ মৃত্যুবরণ করেন।

ফরাসী বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া অগাস্ট কোঁৎ- এর সমাজ সম্পর্কিত চিন্তা ও তত্ত্বকে বহুলাংশে প্রভাবিত করেছে। ফরাসী বিপ্লব সামন্তবাদের অবসান ঘটিয়ে শ্রেণিবৈষম্যজনিত সমাজব্যবস্থা কাঠামো ভেঙ্গে দেয়। সমাজে চরম বিশৃঙ্খলা ও অসংগতি বিরাজ করতে থাকে। অগাস্ট কোঁৎ তৎকালীন ফ্রান্সের বিশৃঙ্খলা ও অস্থিতিশীলতা পর্যবেক্ষণ করে সমাজ পুর্ণগঠনের চিন্তায় মনোনিবেশ করেন। কোঁৎ এর প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে Positive Philosophy এবং Positive Polity বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮৩৯ সালে তিনি *'Sociology'* প্রত্যয়টি প্রথম ব্যবহার করেন। তার প্রধান তত্ত্বগুলোর মধ্যে ত্রয়স্তর সূত্র, দৃষ্টবাদ এবং বিজ্ঞানের ক্রমসোপান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ত্রয়স্তর সূত্র (Law of Three Stages)

কোঁতের ত্রয়স্তর সূত্র প্রধানত মানব জ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত। সমাজের বিকাশ বলতে তিনি জ্ঞান-বুদ্ধির বিকাশকেই বুঝিয়েছেন। জ্ঞানের স্তরের পরিবর্তনের সাথে সাথে সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। কোঁৎ সমাজকে দেখেছেন ক্রমবিকাশ ও প্রগতির প্রক্রিয়া হিসেবে। তাঁর মতে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি তিনটি স্তরের মাধ্যমে বিকশিত হয়ে যৌক্তিক ও বিজ্ঞানমনস্ক রূপ লাভ করেছে। বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের তিনটি স্তর হচ্ছে:

১। ধর্ম সম্বন্ধীয় স্তর (Theological Stage)
২। অধিবিদ্যা সম্বন্ধীয় স্তর (Metaphysical Stage) এবং
৩। দৃষ্টবাদী স্তর (Positive Stage)

১। ধর্ম সম্বন্ধীয় স্তর

মানুষের জ্ঞানের প্রাথমিক পর্যায় হচ্ছে ধর্ম সম্বন্ধীয় স্তর। এ স্তরে মানুষ প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার কোনো ক্ষমতা অর্জন করতে পারেনি। প্রকৃতিতে ঘটে যাওয়া ঘটনার কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করতে পারেনি। মানুষ মনে করেছে প্রকৃতিতে সবকিছুই অতিপ্রাকৃত শক্তির ইশারায় চালিত ও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এ স্তরে মানুষের মন ধর্মীয় ভাবাবেগে আচ্ছন্ন থাকে। এ স্তরকে আবার তিনটি ধাপে বিভক্ত করা হয়। যথা-

(ক) প্রকৃতি পুজা (Fetishism)**:** এ পর্যায়ে অতিপ্রাকৃত ধ্যানধারণার বিকাশ ঘটে যা ভক্তি ও অন্ধ বিশ্বাস থেকে সৃষ্টি হয়।
(খ) বহুদেববাদ (Politheism): এ পর্যায়ে বিশ্বাস করা হয় যে, মহাবিশ্ব বহু দেবদেবতা দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।
(গ) একেশ্বরবাদ (Monotheism): এ পর্যায়ে বিশ্বাস করা হয় মহাবিশ্ব এক ঈশ্বর দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত।

ধর্ম সম্বন্ধীয় স্তরে প্রাধান্য থাকে পুরোহিত ও যাজক শ্রেণির হাতে এবং ধর্মই এই স্তরে সমাজ গঠন ও সমাজ পরিচালনার মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে।

২। অধিবিদ্যা সম্বন্ধীয় স্তর

অধিবিদ্যা সম্বন্ধীয় স্তরটি চিন্তা ও সমাজ বিবর্তনের মধ্যবর্তী পর্যায়। এ স্তরটির অবস্থান ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় স্তর থেকে দৃষ্টবাদী স্তরে উত্তরণের অর্ন্তবর্তী সময়ে লক্ষ করা যায়। এ স্তরে মানুষের চিন্তাজগতে পরিবর্তন হতে শুরু করে। একেশ্বরবাদের পরবর্তী পর্যায়টিতে অধিবিদ্যা সম্বন্ধীয় স্তরের আর্বিভাব ঘটে। মানুষ বিশ্বাস করে যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেবতা দ্বারা পরিচালিত হয় না বরং একটি বিশেষ শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়। অধিবিদ্যা সম্বন্ধীয় স্তরে প্রকৃতি প্রদত্ত অধিকার, প্রাকৃতিক আইন ইত্যকার নানাবিধ বিষয়ে ধারণা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ সময়ে মানুষের মনে জিজ্ঞাসা এসেছে, উৎসাহ বেড়েছে, সমস্যা প্রতিকারের চিন্তা এসেছে, যুক্তি এসেছে। মানুষ তার অস্তিত্বে কর্মের ফল ও ভূমিকা সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন হতে থাকে। অগাস্ট কোঁৎ- এর ধারণা অধিবিদ্যা সম্বন্ধীয় স্তর বেশি দিন স্থায়ী ছিল না। কারণ বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের সাথে সাথে এ স্তর দ্রুত পরিবর্তিত হয় যার মূখ্য ভূমিকা পালন করে বিজ্ঞানের সূচনা ও বিকাশ।

৩। দৃষ্টবাদী স্তর

দৃষ্টবাদী স্তরে মানুষের যুক্তি ও পর্যবেক্ষণ সম্মিলিতভাবে জ্ঞানের উৎস হিসেবে কাজ করে। এ স্তরে মানুষ পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে প্রকৃত বিষয় ও ঘটনার সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপনের মধ্য দিয়েই জ্ঞানের উৎস খুঁজে পায়। তাঁর মতে এ স্তরে পুঁজিপতি ও শিল্পপতিগণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিবে। তাঁর ধারণা ব্যক্তির প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ সামাজিক বিবর্তনের উল্লেখিত স্তরগুলো লক্ষ্য করে এগিয়ে চলে। অগাস্ট কোঁৎ এই জ্ঞানের ধারা তত্ত্বের মাধ্যমে সমাজের বিবর্তনকে উপলব্ধি করেছেন। সামাজিক বিবর্তন বলতে তিনি সমাজের উন্নতি ও প্রগতিকে বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে সামাজিক উন্নতি তিনটি ক্রমিক ধাপের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। যথা- বুদ্ধিগত উন্নতি (Intellectual Development), ভাবগত উন্নতি (Emotional Development) এবং কর্মগত উন্নতি (Activational Development)। অগাস্ট কোঁৎ এর মতে ভাবগত ও কর্মগত উন্নতি বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতির উপর নির্ভরশীল। ত্রয়স্তর সম্পর্কিত আলোচনায় জ্ঞান বিকাশের সাথে সাথে সবার মনে স্বতন্ত্র বোধ জাগ্রত হয়েছে যা দ্বারা সভ্যতার বিকাশ ঘটে।

দৃষ্টবাদ (Positivism)

Positive শব্দ থেকে Positivism প্রত্যয় এসেছে। Positive শব্দের অর্থ হচ্ছে বাস্তব (Real)। বাস্তব বলতে বুঝায় যা কিছু যৌক্তিক, পর্যবেক্ষণ করা যায় এবং যা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাই বলা হয় দৃষ্টবাদ বা Positivism হলো অভিজ্ঞতালব্ধ যেকোনো যৌক্তিক বিষয় সম্পর্কিত মতবাদ। সমাজের বিরাজমান বিশৃঙ্খলা ও অস্থিতিশীলতা দূর করে শান্তিপূর্ণ এবং স্থিতিশীল সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চিন্তায় কোঁৎ সদা তৎপর ছিলেন। তিনি মনে করতেন, দৃষ্টবাদ- এর মাধ্যমেই সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

ফরাসী বিপ্লবোত্তরকালে ফ্রান্সের চিন্তাবিদদের মধ্যে দুটো ধারা পরিলক্ষিত হয়। একটি রক্ষণশীল ধারা– যা বিরাজমান সমাজ ব্যবস্থায় প্রগতি প্রতিষ্ঠার পক্ষে। অপরটি প্রগতিশীল বা বৈপ্লবিক ধারা– যা সমাজ ব্যবস্থা ও প্রথা-প্রতিষ্ঠানের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পক্ষে। অগাস্ট কোঁৎ- এর দৃষ্টবাদে তাঁর রক্ষণশীল চিন্তা ও মনোভাবের কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কোঁৎ মনে করেন, মানব সমাজ পরিবর্তনের অপরিবর্তনীয় সূত্রটি আবিস্কার করে সমাজকে সুসংগঠিত এবং স্থিতিশীল করে প্রগতি নিশ্চিত করা সম্ভব। এটিই ছিল তার দৃষ্টবাদের মূল উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি জ্ঞানের নতুন শাখা হিসেবে সমাজবিজ্ঞান- এর প্রবর্তন করেন।

দৃষ্টবাদ সম্পর্কে কয়েকটি মৌল উপাদান চিহ্নিত করা যায়। এগুলো হলো ক) কোঁৎ এর দৃষ্টবাদ কাল্পনিক নয় বরং বাস্তব ঘটনা বা প্রপঞ্চের সাথে সম্পর্কযুক্ত, খ) সকল জ্ঞান নয় বরং প্রয়োজনীয় জ্ঞানের সাথেই এর সম্পর্ক, গ) দৃষ্টবাদ অস্পষ্ট জ্ঞান নয় বরং যথাযথ এবং সুনির্দিষ্ট জ্ঞানের সাথে সম্পর্কযুক্ত। দৃষ্টবাদ ধারণা তিনটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহলো জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং পর্যবেক্ষণ। অগাস্ট কোঁৎ দৃষ্টবাদকে তিনভাগে ভাগ করেছেন। তা হলো-

(ক) বিজ্ঞানসমূহের দর্শন (Philosophy of Sciences) : মানুষ তার ভাগ্য উন্নয়নে প্রচেষ্টার উপর নির্ভরশীল, এটাই হচ্ছে বিজ্ঞানসমূহের দর্শনের মূল আলোচ্য বিষয়। একে দৃষ্টবাদী দর্শনও (Positive Philosophy) বলা হয়।

(খ) বিজ্ঞান সম্মত ধর্ম ও নীতিশাস্ত্র (Scientific Religion and Ethics) **:** এতে বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক উৎকর্ষতার মধ্য দিয়ে অধিকতর মানবতার সেবায় নিয়োজিত থাকার কথা বলা হয়েছে।

(গ) দৃষ্টবাদী রাজনীতি (Positive Politics)**:** যুদ্ধ বর্জন করে শান্তিপূর্ণ অবস্থা তৈরি করার রাজনীতিনই হলো দৃষ্টবাদী রাজনীতির মূল কথা।

দৃষ্টবাদের বক্তব্য হলো, ভালোবাসাই নীতি, শৃঙ্খলাই ভিত্তি এবং প্রগতিই উদ্দেশ্য। দৃষ্টিবাদের মূলমন্ত্র হচ্ছে "অন্যের জন্য বাঁচো (Live for others)"। সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দৃষ্টবাদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বিজ্ঞানের সোপানক্রম (Hierarchy of Sciences)

অগাস্ট কোঁৎ এর বিজ্ঞানের সোপানক্রম তাঁর ত্রয়স্তরের সূত্রের সাথে সম্পর্কিত। তাঁর মতে, বিভিন্ন বিজ্ঞানের অগ্রগতি হয় বিভিন্ন রকম। যে বিজ্ঞান যতবেশি সরল ও সুস্পষ্ট সে বিজ্ঞান তত দ্রুত দৃষ্টবাদী স্তরে পৌছায়। প্রকৃতির সবকিছুর মধ্যে একটি ক্রম লক্ষ করা যায়। একটা সরল বিষয় থেকে জটিল বিষয় পর্যন্ত একই ক্রম পরিলক্ষিত হয়।

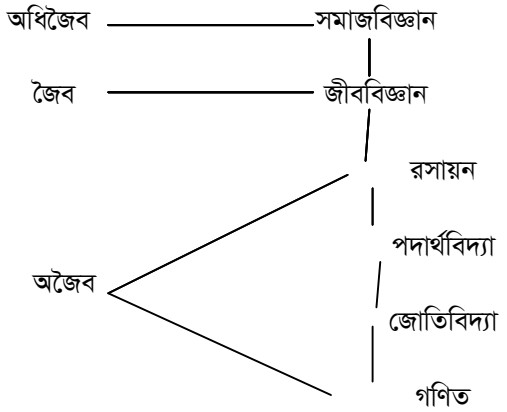

চিত্র ৩.১: বিজ্ঞানের সোপানক্রম

মানুষের মধ্যে প্রথম যে জ্ঞান আসে তা হলো গণিত। সঠিকতা নিরূপণের প্রথম ধাপ গণিত। মানুষের আবিষ্কৃত প্রথম বিজ্ঞান জোতিবিদ্যা যা বিজ্ঞানের ফলিত দিক নির্দেশ করে। পদার্থবিদ্যায় পদার্থ জগত সম্পর্কে সূত্র আবিষ্কার করে। রসায়ন কোন পদার্থ কোন সূত্রের সাহায্যে একে অপরের সাথে মিলিত হচ্ছে তা নির্ণয় করে। একটি পৃথক শাখা হিসেবে জীববিজ্ঞান জীবনের উদ্ভব, বিকাশ, বিনাসের সূত্র আবিষ্কার করে। সমাজবিজ্ঞানের কাজ হলো সমাজের উদ্ভব, বিকাশ ও পরিবর্তনের সূত্র নির্ণয় করে। অগাস্ট কোঁৎ সমাজবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের সোপানক্রমে সবার উপরে স্থান দিয়েছেন। কারণ, অজৈব প্রাণহীণ বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন করা যত সহজ তার চেয়ে জটিল হলো জৈব বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন করা। অধিজৈব (Super organic) বিষয়ে অধ্যয়ন আরো বেশি জটিল। সমাজবিজ্ঞান মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে অধ্যয়ন করে। কোঁতের মতে, মানব সমাজ ও সংস্কৃতি অধিজৈব বিষয় এবং তা সদা পরিবর্তনশীল। ফলে সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অধ্যয়ন করা অত্যন্ত জটিল। একারণে সমাজবিজ্ঞানকে সবার উপরে স্থান দিয়েছেন। তাছাড়া অন্যান্য বিজ্ঞানকে তিনি সমাজবিজ্ঞানের ভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	অগাস্ট কোঁতের তত্ত্বগুলো নিয়ে একটি ছক তৈরি করুন।	**সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

অগাস্ট কোঁৎ সমাজবিজ্ঞানের জনক বলে পরিচিত। সমাজ নিয়ে পৃথকভাবে বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা তিনিই প্রথম অনুভব করেন। তাঁর ত্রয়স্তরের সূত্র যেমন বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের ধারণা দেয় তেমনি দৃষ্টবাদ বৈজ্ঞানিক ধারণা প্রদান করে। বিজ্ঞানের সোপানক্রমের মাধ্যমে তিনি সমাজবিজ্ঞানকে যৌক্তিকভাবে বৈজ্ঞানিক মর্যাদায় স্থান দেবার প্রচেষ্টা নেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় স্তর কয়টি ধাপে বিভক্ত ?

(ক) দুই (খ) তিন

(গ) চার (ঘ) পাঁচ

২। দৃষ্টবাদী রাজনীতির মূল লক্ষ্য কী?

(ক) ক্ষমতা দখল করা (খ) যুদ্ধ করা

(গ) যুদ্ধ বন্ধ করে শান্তিপূর্ণ অবস্থা তৈরি করা (ঘ) অন্য রাষ্ট্র দখল করা

৩। অধিজৈব বলতে কী বুঝায়?

(ক) বুদ্ধিমান প্রাণি মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতি (খ) প্রাণহীন সম্পর্কিত

(গ) প্রাণ আছে এমন সম্পর্কিত (ঘ) উভচর সম্পর্কিত

পাঠ-৩.৪ হার্বার্ট স্পেন্সার
Herbert Spencer

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- হার্বার্ট স্পেন্সারের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- স্পেন্সারের বিবর্তনবাদ আলোচনা করতে পারবেন এবং
- জীবদেহের সঙ্গে সমাজের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	হার্বার্ট স্পেন্সার, বিবর্তনবাদ, সরল সমাজ, জটিল সমাজ, জৈবিক সাদৃশ্যবাদ।

জীবন ও কর্ম

আঠারো শতকের নতুন চিন্তাবিদগণ সমাজ অধ্যয়নের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণের উদ্ভব ঘটান। বিবর্তনবাদী মতবাদের অনুসারীরা সমাজকে বিশ্লেষণ করেন জীব বিবর্তনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যার মূল প্রবক্তা হলেন হার্বার্ট স্পেন্সার। তিনি বিজ্ঞানের দুটি ভিন্নতর শাখা যথা জীববিদ্যার ও পদার্থবিদ্যার সূত্র গ্রহণ করে সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তা ব্যবহার করেন। সমাজ যে একটি ক্রমবিকাশমান বিষয় তা প্রমাণে সক্ষম হন। সমাজবিজ্ঞানে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ প্রয়োগের বিষয়টিকে আরো মজবুত করেন।

হার্বার্ট স্পেন্সার ১৮২০ সালে ইংল্যান্ডের ডার্বি শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শারীরিক অসুস্থতার কারণে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেননি। তবে তিনি তাঁর শিক্ষক পিতার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৭ বছর বয়সে তিনি রেলওয়ের চাকুরী শুরু করেন। ১৮৪১ সাথে নতুন রেলওয়ে স্থাপনের সময় কিছু ফসিলের (জীবদেহের দেহাবশেষ) সন্ধান পান যা তাকে ভূতত্ত্বের প্রতি আগ্রহী করে তোলে। পরবর্তীতে তিনি মানব জাতির উদ্ভব ও বিবর্তন সম্পর্কে আগ্রহী হন। তিনি সমাজ বিবর্তনের ক্ষেত্রেও ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াটি অনুধাবন করেন। স্পেন্সার বিশ্বজনীন বিবর্তনের তত্ত্বের মাধ্যমে (The Theory of Universal Evolution) সমাজ বিবর্তনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া উপস্থাপন করেন।

হার্বার্ট স্পেন্সারের উল্লেযোগ্য রচনাবলি হলো Social Statics, First Principles, Principles of Biology, Princeples of Psychology, The Study of Sociology, Principles of Sociology, Synthetic Philosophy. হার্বার্ট স্পেন্সার ১৯০৩ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

স্পেন্সারের বিবর্তনবাদ (Spencer's Evolutionism)

সাধারণভাবে বিবর্তন হলো সহজসরল অবস্থা থেকে ক্রমান্বয়ে জটিল অবস্থায় পরিবর্তিত হওয়া। এখানে কোনো প্রকার শক্তি প্রয়োগ করতে হয় না। প্রকৃতিগতভাবেই এই পরিবর্তন ঘটে। কোসার (Coser) এর মতে, বিবর্তন হচ্ছে তুলনামূলকভাবে অনির্দিষ্ট হতে নির্দিষ্ট, অসংগতিপূর্ণ হতে সংগতিপূর্ণ এবং স্বাদশ্যপূর্ণ হতে বৈসাদৃশ্যে রূপান্তর (Evolution, that is a change from a state of relatively indifiinite, incoherent, homogeneity to a state of relatively definite, coherent, heterogeneity). স্পেন্সার সমাজ আলোচনায় শুধু বৈজ্ঞানিক বা ধর্মীয় চিন্তাধারার আওতায় আবদ্ধ থাকাকে সীমাবদ্ধতা বলেছেন। তাঁর ধারণা বিশ্বব্রহ্মান্ডে এমন অনেক ঘটনা বা বিষয় আছে যা সীমাবদ্ধ জ্ঞান দ্বারা অনুধাবন করা সম্ভব নয়। এ জন্য সমগ্র প্রপঞ্চকে দুই ভাগে ভাগ করেন। তা হলো জ্ঞেয় (Known) এবং অজ্ঞেয় (Unknown)। বিশ্বপ্রভু সম্পর্কিত রহস্যের পাশাপাশি তার মনে বস্তুর উদ্ভব, অবস্থান সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন জাগে। সকল প্রশ্নের উত্তর সন্ধানে তিনি ক্রমেই অজ্ঞেয় দর্শনের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন। এক সময় তিনি ব্যস্ত হন সমাজের উদ্ভব, বিকাশ ও বিনাসের প্রক্রিয়া অনুসন্ধানে। সকল প্রাণি সমসাদৃশ্যমূলক অবস্থা থেকে বৈসাদৃশ্যের দিকে অগ্রসরমান হয়। বায়ারের এই তত্ত্ব স্পেনসারের চিন্তার জগতে এক নতুন মাত্রা যোগ করে। তিনি বায়ারের এই তত্ত্বকে সমাজ বিবর্তনের আলোচনায় নিবিষ্ট হন।

হার্বার্ট স্পেন্সার সামাজিক বিবর্তনতত্ত্ব অতিজৈব (Super Organic) ধারণার উপর ভিত্তি করে তৈরি করেন। তাঁর মতে সমাজ অজৈব (Inorganic) থেকে অতিজৈব (Super Organic) এ পৌঁছেছে এবং এক একটি স্তরে লক্ষ লক্ষ বছর কেটেছে। অজৈব (Inorganic) স্তর হলো যেখানে প্রাণের অস্তিত্ব নেই। জৈব (Organic) স্তর হলো যেখানে প্রাণের অস্তিত্ব আছে। আর অধিজৈব (Super Organic) স্তর হল বুদ্ধিমান প্রাণি মানুষের সৃষ্ট সমাজ ও সংস্কৃতির উন্নত রূপ। হার্বার্ট স্পেন্সার বিশ্বজনীন বিবর্তনের ধারাকে প্রবিষ্ট করেছেন সমাজ বিবর্তনে গতিরেখা অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে। তাঁর মতে বিবর্তন প্রক্রিয়া সমাজ বিকাশের ক্ষেত্রে তার নির্দিষ্ট কতকগুলো ধাপ রয়েছে। এগুলো হচ্ছে, পরিধির বিস্তার (Greater Size), সংঘবদ্ধতা (Coherence), সুনির্দিষ্টতা (Definiteness) এবং পারস্পরিক নির্ভরশীলতা (Interdependence)। হার্বার্ট স্পেন্সার সামাজিক বিবর্তনের ক্ষেত্রে দুইটি পর্যায় লক্ষ করেন। তা হলো (ক) সহজ-সরল সমাজ থেকে মিশ্র সমাজে গমন এবং (খ) যোদ্ধা সমাজ (Militant Society) থেকে শিল্পসমাজে (Industrial Society) পবির্তন। সরল সমাজ থেকে মিশ্র সমাজে গমন (The Movement from simple to compound) অনুধাবনের জন্য তিনি চার ধরনের সমাজের কথা বলেছেন। এর মাধ্যমে বোঝা যায়, কীভাবে সমাজ সরল অবস্থা থেকে জটিল অবস্থায় উন্নীত হয়েছে। সমাজগুলো হলো:

(১) সরল সমাজ (Simple society),
(২) জটিল বা মিশ্র সমাজ (Compound society),
(৩) দ্বিগুণ জটিল সমাজ (Double Compound society) এবং
(৪) ত্রিগুণ জটিল সমাজ (Treble Compound Society)।

(১) **সরল সমাজঃ** এ ধরনের সমাজ ক্ষুদ্র, যাযাবর এবং এখানে স্থায়ী সম্পর্কের অভাব বিদ্যমান। তাদের মধ্যে খুব সামান্য ভিন্নতা, বিশেষীকরণ এবং পূর্ণতা ছিল। এস্কিমো, ফুজিয়ান, পাপুয়ানিউগিনির ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এধরনের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে।
(২) **মিশ্র সমাজঃ** এ ধরনের সমাজ কৃষি নির্ভর এবং মোটামুটি স্থায়ী। অধিকাংশই পশুচারণের উপর নির্ভরশীল। এখানে বিভিন্ন শ্রেণি দেখা যায় তবে তা পুরোহিত প্রধান, শিল্পকাঠামোর বিকাশ ঘটে যা উন্নত শ্রমবিভাজন নির্দেশ করে। উদাহরণ হিসেবে পঞ্চম শতকের টিউটনিক জনগণ (The Teutonic Peoples), হোমারিক গ্রিক জনগোষ্ঠী উল্লেখযোগ্য।
(৩) **দ্বিগুণ মিশ্রসমাজঃ** এ ধরনের সমাজ সম্পূর্ণরূপে স্থায়ী। বৃহৎ ও পরিপূর্ণ এ সমাজে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক কাঠামো, কমবেশি জাতি-প্রথা, জটিল শ্রমবিভাজন এবং সর্বোপরি জ্ঞান ও শিল্পের বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণ হিসেবে ত্রয়োদশ শতকের ফ্রান্স, একাদশ শতকের ইংল্যান্ড- এর সমাজ এরূপ বৈশিষ্ট ধারণ করে।
(৪) **ত্রিগুণ মিশ্র সমাজঃ** এ ধরনের সমাজ আধুনিক সভ্য জাতির পরিচায়ক যেখানে অতিমাত্রায় বিশেষীকরণ (Specialization) শ্রমবিভাজন, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন পরিলক্ষিত হয়।

হার্বার্ট স্পেন্সার উল্লিখিত সমাজগুলোর মধ্য দিয়ে সমাজের পরিধির বিস্তার, জটিলতা, জটিল শ্রমবিভাজন, জনসংখ্যার বৃদ্ধি, সংস্কৃতি এবং সাধারণ সাংস্কৃতিক জটিলতার বিষয়কেই স্পষ্ট করেছেন যার দ্বারা বিবর্তন প্রক্রিয়ার সহজ সরল সমাজ থেকে ক্রমান্বয়ে জটিল সমাজের রূপ পরিগ্রহ করে।

স্পেন্সার যোদ্ধা সমাজ (Militant Society) থেকে শিল্প সমাজে (Industrial Society) পরিবর্তনে উভয় সমাজের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেন। যোদ্ধা সমাজে প্রাথমিক পর্যায়ে যুদ্ধ ছিল প্রকৃতির বিরুদ্ধে। পরবর্তীতে যুদ্ধ হয় গোষ্ঠী বা সমাজের বিরুদ্ধে। খাদ্য ও আবাস্থলের প্রয়োজনীয়তা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা সংগ্রামকে অনিবার্য করে তুলেছিল। তাই বলা হয়, সমাজ বিকাশের প্রথম পর্যায় ছিল মূলত যোদ্ধা সমাজ। সরল এ যোদ্ধা সমাজ থেকেই ক্রমান্বয়ে শিল্প সমাজের উদ্ভব হয়। মূলত সরল সমাজ হতে জটিল সমাজে উত্তরণ হচ্ছে সমসত্ত্ব থেকে অসমসত্ত্বে রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়া। হার্বার্ট স্পেন্সার মনে করেন, সামাজিক বিবর্তনে বস্তু, গতি ও শক্তি এই তিনটি সূত্রের সমন্বয়ে সৃষ্ট অনুসিদ্ধান্তসমূহের উপস্থিতি রয়েছে।

জৈবিক সাদৃশ্যবাদ (Organic Solidarity)

হার্বার্ট স্পেন্সার সমাজের বিবর্তনকে জীব জগতের বিবর্তনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি মানব সমাজকে একটি সচেতন সত্ত্বা রূপে বিবেচনা করছেন। তাঁর মতে উদ্ভব, বিকাশ, পরিপূর্ণতা এবং কর্মপদ্ধতি সকল ক্ষেত্রেই জীবদেহের সঙ্গে সমাজের মিল রয়েছে। জীবদেহ ও সমাজের মধ্যকার সাদৃশ্য বিশ্লেষণই হলো তাঁর 'জৈবিক সাদৃশ্যবাদ'। স্পেনসারের মতে জীবজগতের উন্মেষ ঘটে এককোষী অ্যামিবা হতে। বিবর্তনের শেষ পর্যায়ে এসে তা রূপ নেয় বহুকোষী জীব হিসেবে।

অনুরূপভাবে উদ্ভরের সময় সমাজ ছিল সরল ও অনির্দিষ্ট। পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সরল যোদ্ধা সমাজ জটিল শিল্প সমাজে পরিণত হয়েছে। স্পেন্সার জীবদেহ ও সমাজের মধ্যে যে সব সাদৃশ্য লক্ষ করেছেন সেগুলো হচ্ছে:

(১) **অজৈব সত্ত্বা থেকে পৃথক:** জীবদেহ ও সমাজ উভয়ই অজৈব সত্ত্বা হতে পৃথক;

(২) **কাঠামোগত জটিলতা:** সমাজ ও জীবদেহের আকারগত সম্প্রসারণের সাথে সাথে তাদের কাঠামোগত জটিলতার বৃদ্ধি পায়;

(৩) **কাঠামোগত পৃথকীকরণ:** সমাজ ও জীবদেহের ক্ষেত্রে কাঠামোগত পৃথকীকরণ তাদের ক্রিয়াগত পার্থক্য তৈরি করে;

(৪) **ধ্বংস ও টিকে থাকা:** সমাজ ও জীবদেহ উভয়েরই ধ্বংস অনিবার্য, কিন্তু তাদের এককসমূহ টিকে থাকে।

হার্বার্ট স্পেনসারের মতে জীবদেহ ও সমাজ উভয়ই একটি বিশেষ ব্যবস্থায় (System) পরিচালিত হয়। এ ব্যবস্থায় সমাজ এবং জীবদেহের নিজস্ব কিছু উপাদান সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। বিষয়টিকে নিম্নে ছকের মাধ্যমে দেখানো হল:

ব্যবস্থা	জীবদেহ	সমাজ
নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা	মস্তিস্ক	আইন, ধর্ম, বিচার বিভাগ, পুলিশ প্রভৃতি
পরিপোষণ ও পুষ্টিসাধনমূলক ব্যবস্থা	হরমোন, পৌষ্টিকনালী, পৌষ্টিক গ্রন্থি	উৎপাদন ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা প্রভৃতি
বিতরণমূলক ব্যবস্থা	হৃদপিন্ড	অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, শ্রমবিভাগ, ব্যবস্থাপনা বিভাগ।

শিক্ষার্থীর কাজ	স্পেন্সারের বিবর্তনমূলক সমাজের ধাপগুলো লিখুন	**সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

হার্বার্ট স্পেন্সার জীববিদ্যা ও পদার্থবিদ্যার সূত্র প্রয়োগ করে সমাজ বিবর্তনবাদ তত্ত্বের ধারণা দেন। সমাজকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। জৈবিক সাদৃশ্যবাদ তত্ত্বের মাধ্যমে কাঠামোগত ক্রিয়াবাদের ধারণা প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেন। তিনি পারস্পরিক নির্ভরশীলতা সমাজবন্ধন ও ঐক্যের মূল সূত্র বলে উল্লেখ করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। 'Survival of the fittest' ধারণাটি কে প্রদান করেন ?

(ক) স্পেন্সার (খ) ডারউইন

(গ) ওয়েবার (ঘ) নিউটন

২। বিবর্তন বলতে কী বুঝায়?

(ক) সহজ-সরল অবস্থা থেকে জটিল অবস্থায় রূপান্তর

(খ) জটিল অবস্থা থেকে সহজ-সরল অবস্থায় রূপান্তর

(গ) ধীর গতি থেকে দ্রুত গতি

(ঘ) দ্রুত গতি থেকে ধীর গতি

পাঠ-৩.৫ এমিল ডুর্খেইম
Emile Durkheim

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- এমিল ডুর্খেইমের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- সামাজিক ঘটনার তাৎপর্য বর্ণনা করতে পারবেন
- ডুর্খেইমের আত্মহত্যা তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- সমাজে শ্রমবিভাজনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- ডুর্খেইমের ধর্ম বিষয়ক তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	এমিল ডুর্খেইম, সামাজিক ঘটনা, আত্মহত্যা, শ্রমবিভাজন, ধর্ম।

জীবন ও কর্ম

সমাজবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠায় যে কয়েকজন মুষ্টিমেয় সমাজবিজ্ঞানী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলো এমিল ডুর্খেইম। তিনিই প্রথম সমাজের বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা, পর্যালোচনা ও আলোচনার সূত্রপাত ঘটান যার মাধ্যমে সমাজ সম্পর্কে পঠন-পাঠনে অগ্রহী হন। হার্বার্ট স্পেন্সার ব্যক্তিকে সমাজ বিশ্লেষণের একক হিসেবে গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু ডুর্খেইম সমাজ-সংগঠনকেই একক ধরে সমাজ বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে ব্যক্তির মাধ্যমে সমাজ গঠিত হলেও সমাজই ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত করে।

ডুর্খেইম ১৮৫৮ সালে ফ্রান্সের লোরিন প্রদেশে এক ধর্মযাজক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্যারিসের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দর্শন, সাহিত্যে শিক্ষা লাভের পর তিনি সমাজবিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। তিনি তাঁর সমাজ সম্পর্কিত ভাবনা-চিন্তা বিভিন্ন গ্রন্থে মাধ্যমে প্রকাশ করেন। ডুর্খেইম রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে *The Division of Labor in Society, The Rules of Sociological Method, Suicide, Sociology and Philosophy, The Elementary forms of Religious life* উল্লেখযোগ্য। ১৯০২ সালে তিনি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। সামাজিক ঘটনা, আত্মহত্যা, শ্রমবিভাজন, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব প্রদান করেছেন। ১৯১৭ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সামাজিক ঘটনা (Social Fact)

ডুর্খেইমের সমাজবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয় হলো সামাজিক ঘটনা। তাঁর মতে 'সমাজবিজ্ঞান হলো সামাজিক ঘটনাসমূহের বিজ্ঞান'। সমাজবিজ্ঞানের কাজ হলো সামাজিক ঘটনাসমূহ অধ্যয়ন করা। সামাজিক ঘটনা বলতে কোনো জনগোষ্ঠীর চিন্তা-চেতনা, প্রবণতা, রীতিনীতি প্রভৃতিকে বুঝায়। তবে সমাজে যা কিছু আছে তার সবই সামাজিক ঘটনা নয়। এ জন্য তিনি দুটি বিষয় গুরুতপূর্ণ। প্রথমত: যাকে সামাজিক ঘটনা বলা হবে তা ব্যক্তির উপর চাপ প্রয়োগ করতে পারবে। দ্বিতীয়ত: যাকে ঘটনা বলা হবে তা সমাজ বা গোষ্ঠীতে বিস্তার লাভ করতে পারবে। সামাজিক ঘটনা সম্পর্ক ধনাত্নক (Positive) এবং ঋণাত্নক (Negative) ধারণা আছে। তবে ঋণাত্নক ধারণা সামাজিক ঘটনা নয়। যেমন কারও ব্যক্তিগত ঘটনা সামাজিক ঘটনা নয়। কারণ, তা অন্যের উপর চাপ প্রয়োগ করতে পারে না এবং সমাজই এর বিস্তৃতিও ঘটে না। আবার অনুকরণ বা ফ্যাশন সামাজিক ঘটনা নয়। কারণ এগুলোর জন্য অন্যকে বাধ্য করা যায় না। তবে তিনি বলেছেন ধনাত্নক ধারণা সামাজিক ঘটনার পর্যায়ে পড়ে। এ ক্ষেত্রে তিনি সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে সামাজিক ঘটনা বলেছেন। যেমন- পরীক্ষার হল, শ্রেণিকক্ষ এগুলোর নিয়ম কানুন না পালন করলে তাকে শাস্তি পেতে হয় যা অন্যের উপর চাপ প্রয়োগ করে। তদুপরি এগুলো পালন করা প্রয়োজন তা সমাজের অপরাপর সবাই জানতে ও পালন করতে আগ্রহী হয় যা বিস্তৃতি ঘটায়। ডুর্খেইমের মতে সমাজবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ ব্যক্তি থেকে নয় গোষ্ঠী থেকে শুরু করতে হবে। কারণ গোষ্ঠী ব্যক্তির আগে। ব্যক্তি যে ব্যক্তি তা গোষ্ঠীরই সৃষ্টি যা শুরু করতে হবে পরিবার থেকেই। তিনি বলেন সামাজিক ঘটনা

অবশ্যই বাহির থেকে অধ্যয়ন করতে হবে। তিনি সামাজিক ঘটনাকে প্রকৃত বস্তু হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন। তাঁর মতে, সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়নে সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে বস্তু হিসেবে দেখতে হবে। সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সুনির্দিষ্ট হতে হবে। কোনো অস্পষ্ট বিষয় সমাজবিজ্ঞানে অধ্যয়ন করা যাবে না। বিষয়বস্তু পর্যবেক্ষণযোগ্য হতে হবে। এজন্যই সমাজবিজ্ঞানের ভিত্তি রচনায় তাঁর অবদান অনেকের চেয়ে বেশি।

আত্মহত্যা (Suicide)

এমিল ডুর্খেইমের মতে আত্মহত্যা একটি সামাজিক ঘটনা। তিনি সামাজিক সংহতি এবং সামাজিক সচেতনতার সাথে আত্মহত্যা সম্পর্ক নিরূপণ করেছেন। অভিজ্ঞতাভিত্তিক ও পরিসংখ্যানগত পদ্ধতির মাধ্যমে তিনি আত্মহত্যা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি তাঁর Suicide গ্রন্থে আত্মহত্যার জৈবিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং ভৌগোলিক কারণসমূহকে যৌক্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করে সামাজিক কারণসমূহকে গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরেন। তিনি আত্মহত্যাকে সামাজিক সংহতির সাথে সম্পর্কিত করেন। তিনি মূলত: অন্যের যুক্তি খন্ডন করেন তারপর আলোচ্য বিষয়ে নিজের যুক্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আত্মহত্যাকে শ্রমবিভাজনের নেতিবাচক দিক হিসেবে ব্যাখ্যা করেন যা সামাজিক সংহতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। আত্মহত্যা প্রসঙ্গে এ্যারোন বলেন, আত্মহত্যা হলো আত্মহত্যাকারী কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইতিবাচক বা নেতিবাচ ঘটনা যা মৃত্যু ঘটায়। (Suicide is every case of death resultiry directly or indirectly from a positive or negative act performed by the victim himself and which strives to produce this result)। তাই বলা যায় আত্মহনন করা তথা নিজের জীবন নিজের দ্বারা নিঃশেষ হওয়া হলো আত্মহত্যা। আত্মহত্যা প্রসঙ্গে ডুর্খেইম বলেন, যারা সমাজের সাথে অতিমাত্রায় সম্পৃক্ত তারা আত্মহত্যা করে। আবার যারা সমাজ থেকে অতিমাত্রায় বিচ্ছিন্ন তারাও আত্মহত্যা করে। একারণে বিভিন্ন ধরনের আত্মহত্যার ধারণা তিনি দেন। তিনি প্রধানত তিন ধরনের আত্মহত্যার উল্লেখ করেছেন। এগুলো হল:

(১) আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যা (Egoistic Suicide),
(২) পরার্থপর আত্মহত্যা (Altruistic Suicide) এবং
(৩) নৈরাজ্যমূলক আত্মহত্যা (Anomic Suicide)।

(১) **আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যা:** সমাজ বা গোষ্ঠীর সঙ্গে সংহতির অভাব দেখা দিলে এ ধরণের আত্মহত্যা ঘটে। সমাজ থেকে ব্যক্তি যখন নিজেকে বিচ্ছিন্ন মনে করে তখন এ ধরনের আত্মহত্যা ঘটে। সচরাচর যে সকল সমাজে সামাজিক সংহতি কম থাকে সে সকল সমাজে আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি হয়। ডুর্খেইম পরিসংখ্যানের মাধ্যমে দেখান যে, বিবাহিতদের চেয়ে অবিবাহিতদের মধ্যে, মহিলাদের চেয়ে পুরুষদের মধ্যে, গ্রামবাসীদের চেয়ে নগরবাসীদের মধ্যে এ ধরনের আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি।

(২) **পরার্থপর আত্মহত্যা:** আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যার বিপরীত ধারণা হলো পরার্থপর আত্মহত্যা। কারণ ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের অতিমাত্রায় সংহতির কারণে এ ধরণের আত্মহত্যা দেখা যায়। এ ধরনের আত্মহত্যায় ব্যক্তি নিজের জীবনকে প্রয়োজনের কাছে তুচ্ছ মনে করে। ফলে সমাজ তথা রাষ্ট্রের প্রয়োজনে মৃত্যু জেনেও কাজ করতে গিয়ে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে। সাধারণত যেকোনো দেশের স্বাধীনতা বা স্বাধীকার আন্দোলনে জীবন উৎসর্গ করে। আবার যুদ্ধ ক্ষেত্রে সৈনিকগণ জীবন দান করেন, যা ঐ সমাজের সঙ্গে অতিমাত্রায় সংহতিকেই প্রকাশ করে।

(৩) **নৈরাজ্যমূলক আত্মহত্যা:** যখন সমাজে ব্যক্তির উপর মূল্যবোধের প্রভাব হারিয়ে ফেলে তখন তাকে নৈরাজ্যমূলক অবস্থা বলে। এ ধরনের পরিস্থিতি হলে ব্যক্তি তার নিজ নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী আচরণ করে যা সামাজিকভাবে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় যার প্রভাবে বা কারণে অনেকে আত্মহত্যা করে। এ রকম পরিস্থিতিতে আত্মহত্যা করাকেই নৈরাজ্যমূলক আত্মহত্যা বলে। সাধারণত যেকোনো বিপ্লব বা দুর্যোগের পর এ ধরণের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। যেমন ফরাসী বিপ্লব পরবর্তী সময়ের ফ্রান্সের সমাজ ব্যবস্থা, যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর এ ধরনের অবস্থা তৈরি হতে পারে।

এ ছাড়া তিনি আরো এক ধরনের আত্মহত্যার কথা বলেন, তা হলো নিয়তিবাদী আত্মহত্যা (Fatalistic Suicide)। এ ধরনের আত্মহত্যর ক্ষেত্রে নিয়ম-কানুনের অতিরিক্ত কড়াকড়ি আরোপ হয়ে থাকে। নিয়ম-কানুনের অতি কড়াকড়িতে মানুষের জীবন যখন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে এবং নিজের জীবন হনন করে তখন তাকে নিয়তবাদী আত্মহত্যা বলে। যেমন দাস সমাজে দাসগণ অতিরিক্ত অত্যাচার নিপীড়নে আত্মহত্যা করে। অতিরিক্ত শাসনে কেউ আত্মহত্যা করতে পারে।

ডুর্খেইমের আত্মহত্যা সম্পর্কিত আলোচনায় সংহতি (Integration) এবং নিয়ন্ত্রণের (Regulation) বিশেষ প্রভাব রয়েছে। এর মাধ্যমে আত্মহত্যার শ্রেণিকরণ নির্ধারিত হয়। বিষয়টি নিম্নের সারণিতে তুলে ধরা হল:

বন্ধনের ধরন	মাত্রা	আত্মহত্যার ধরন
সংহতি	নিম্ন	আত্মকেন্দ্রিক
	উচ্চ	পরার্থপর
নিয়ন্ত্রণ	নিম্ন	নৈরাজ্যমূলক
	উচ্চ	নিয়তবাদী

শ্রমবিভাজন (The Division of Labor)

শ্রমবিভাজন একটি প্রাচীন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এটা প্রথম ব্যবহার করেন এ্যাডাম স্মিথ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Inquary into the Nature and Causes of the Wealth of Nation এ। তিনি অর্থনীতিতে প্রত্যয়টি ব্যবহার করেন কর্ম-প্রক্রিয়া (Work Process) হিসেবে। এমিল ডুর্খেইম তাঁর সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে অত্যন্ত সফলভাবে শ্রমবিভাজন প্রত্যয়টি ব্যবহার করেছেন। শ্রমবিভাজনকে তিনি দেখেছেন সামাজিক ঘটনা হিসেবে। তিনি তাঁর *The Division of Labor in Society* গ্রন্থে শ্রমবিভাজন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, শ্রমবিভাজনের মাধ্যমে সমাজের সংহতি (Solidarity) নির্ধারিত হয়। শ্রমবিভাজনের দিক থেকে সামাজিক সংহতিকে তিনি দুইভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা:

(১) যান্ত্রিক সংহতি (Mechanical Solidarity) এবং

(২) জৈবিক সংহতি (Organic Solidarity)।

(১) যান্ত্রিক সংহতি: আদিম সমাজের মানুষের মধ্যে বয়স, লৈঙ্গিক পার্থক্য থাকলেও কাজের পার্থক্য খুব বেশি ছিল না। তাদের মধ্যে চিন্তা-চেতনা, আচার-আচরণ ও মূল্যবোধে সাদৃশ্য ছিল। এ সমাজকে ডুর্খেইম যন্ত্রের সাথে তুলনা করেছেন। এ সমাজে শ্রমবিভাজন না থাকায় পারস্পরিক সম্পর্ক অনেক বেশি নির্ভরশীল ছিল। একটি ইঞ্জিন যেমন বিভিন্ন যন্ত্রের সমন্বয় ছাড়া চলতে পারে না, তেমনি এ সমাজের সদস্যরাও বিচ্ছিন্নভাবে চলতে পারত না। ডুর্খেইমের মতে আদিম সমাজের মানুষ দুটো কারণে ঐক্যবদ্ধ হতো। তা হলো যৌথ প্রতিরূপ (Collective Conscience) এবং দমনমূলক আইন (Repressive Law)। এ ধরনের সমাজব্যবস্থায় যান্ত্রিক সংহতি লক্ষ করা যায়।

(২) জৈবিক সংহতি: জৈবিক সংহতি হলো বৈসাদৃশ্যের ঐক্যমত। এখানে সদস্যের মধ্যে চিন্তায়, আচরণে এবং মূল্যবোধে তেমন সাদৃশ্য থাকে না। এ ধরনের সমাজব্যবস্থা জীবদেহের সঙ্গে তুলনা করা হয়। কারণ জীদেহে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকে যার কোনো একটি বিকল হলেও জীব সচল থাকে, অন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাজ করে। জৈবিক সংহতিমূলক সমাজব্যবস্থায় কোনো একটি অংশ বা প্রতিষ্ঠান দুর্বল বা অকার্যকর হলেও সমাজ পুরোপুরি থেমে থাকে না। পারস্পরিক নির্ভরশীলতাই শক্তির মূল উৎস। জৈবিক সংহতি সম্পন্ন সমাজ বলতে ডুর্খেইম শিল্পায়িত আধুনিক সমাজব্যবস্থার কথা বলেছেন। যেখানে অধিক মাত্রায় বিশেষীকরণ পরিলক্ষিত হয়। জৈবিক সংহতিতে যে ধরনের আইন মেনে চলা হয় তা হলো প্রতিরোধমূলক আইন (Restitutive Law). যান্ত্রিক সংহতি হতে জৈবিক সংহতিতে উত্তরণের পিছনে যেসব উপাদান দায়ী বলে ডুর্খেইম মনে করেছেন তা হলো জনসংখ্যার বৃদ্ধি, নৈতিকতার উন্নতি, জ্ঞানের বিস্তার বা উন্নয়ন, নগরের বিকাশ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বিশেষীকরণ প্রভৃতি।

ডুর্খেইমের ধর্ম বিষয়ক মতবাদ (Durkheim's Religious theory)

ডুর্খেইমের অন্যতম রচনা হলো *The Elementary forms of Religious Life*। তিনি ধর্মকে একটি সামাজিক ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত করেন। তাঁর মতে ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার আচরণ প্রথমত সমাজ বা গোষ্ঠীর প্রতীক হিসেবে দেখা দেয়। সমাজ সংগঠনই ধর্মীয় উদ্ভবের মূল উৎস। ডুর্খেইম ধর্ম সম্পর্কে সাধারণ তত্ত্বে তথা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পূর্বে আদিম সমাজ সম্পর্কে গবেষণা করেন। তিনি অষ্ট্রেলিয়ার অরুনটা ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর ধর্মীয় আচার ও বিশ্বাস পরীক্ষা করেন। তিনি ই.বি. টেইলরের সর্বপ্রাণবাদ (animism) এবং ম্যাক্স মুলারের প্রকৃতিবাদ (naturalism) সম্পর্কিত ধারণা ব্যাখ্যা করে তা ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করেন। তাঁর মতে, এগুলো ধর্মের পবিত্র ও অলংঘনীয় (sacred) এবং পার্থিব তথা সমালোচনামূলক আদর্শ (profance) ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে সক্ষম নয়। বস্তুর ধারণা, বিশ্বাস এবং আচার আচরণের সমন্বয়ে পবিত্র ও অলংঘনীয় (sacred) গঠিত। এ ধরনের বিশ্বাস, আচার আচরণের সম্পর্ক ধর্মের উদ্ভব ঘটায়। অন্যদিকে সকল ধর্মের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো পার্থিব জগতকে নগণ্য মনে করা।

ডুর্খেইমের মতে ধর্মের কাজ যদি শুধু আচার পালন করা হতো তবে পৃথিবীতে এতদিন ধর্ম টিকে থাকতে পারত না। ধর্মের আরো কিছু মর্মকথা আছে। ধর্মের মর্মকথা বুঝতে হলে আদিম সমাজের ধর্মীয় বিশ্বাস পর্যালোচনা করতে হবে। তিনি ধর্মের উৎপত্তির কথা বলতে গিয়ে টোটেমবাদের কথা বলেছেন। টোটেম বলতে বুঝায় এক ধরনের বিশ্বাস কিংবা প্রথা ও আচার অনুষ্ঠান যার মাধ্যমে কোনো কোনো বিশেষ প্রাণি বা গাছ পালার সঙ্গে একটি বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করে। তিনি টোটেমবাদ পর্যালোচনা করে বলেন, দলবদ্ধ জীবনই ধর্মের উৎপত্তির যথার্থ কারণ। ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠান ঐ জীবনেরই প্রতীক মাত্র। ধর্মের আসল কাজ হলো সমাজে সংহতি সৃষ্টি এবং তা রক্ষা করা।

শিক্ষার্থীর কাজ	সামাজিক সংহতির সাথে আত্মহত্যার সম্পর্ক চিহ্নিত করুন।	**সময় : ৫ মিনিট**

সার-সংক্ষেপ

সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম পুরোধা হচ্ছেন এমিল ডুর্খেইম। তাঁর বহুমুখী তত্ত্ব ও গবেষণাকে কেবল সমাজবিজ্ঞানকেই সমৃদ্ধ করেনি, সামাজিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায়ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। সামাজিকক ঘটনা, শ্রমবিভাজন, সামাজিক সংহতি, আত্মহত্যা এবং ধর্মের সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা এ মনীষীকে স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা দান করেছে। সামাজিক ঘটনা বলতে কোনো জনগোষ্ঠীর চিন্তা চেতনা, প্রবণতা, রীতিনীতি প্রভৃতিকে বুঝায়। তাঁর মতে সমাজের সংহতি (Solidarity) কী ধরনের হবে তা নির্ধারিত হয় শ্রমবিভাজনের মাধ্যমে। আবার আত্মহত্যার সাথেও তিনি সামাজিক সংহতির সম্পর্ক দেখিয়েছেন। ডুর্খেইমের মতে ধর্মের কাজ শুধু আচার-আচরণ পালন করা নয়, ধর্মের আরো কিছু মর্মকথা আছে। ধর্মের উৎপত্তির কথা বলতে গিয়ে তিন টোটেমবাদের কথা বলেছেন। তাছাড়া পবিত্রতা এবং অপবিত্রতার ধারণার মাধ্যমেও তিনি ধর্মের ব্যাখ্যা করেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নিচের কোনটি এমিল ডুর্খেইম রচিত গ্রন্থ?

(ক) Positive Philosophy (খ) Suicide

(গ) Economy and Society (ঘ) Principles of Sociology

২। সামাজিক সংহতির অভাব হলে কোন ধরনের আত্মহত্যা হয়?

(ক) আত্মকেন্দ্রিক (খ) পরার্থপর

(গ) নৈরাজ্যমূলক (ঘ) নিয়তবাদী

৩। এমিল ডুর্খেইমের ধর্ম সম্পর্কীয় আলোচনায় কোন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কথা বলা হয়েছে?

(ক) পাপুয়া নিউগিনি (খ) টোডা

(গ) অরুনটা (ঘ) এস্কিমো

পাঠ-৩.৬ কার্ল মার্কস
Karl Marx

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- কার্ল মার্কসের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- উৎপাদন পদ্ধতি ও শ্রেণি সংগ্রাম তত্ত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- শ্রমের বিচ্ছিন্নতাবোধ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন এবং
- উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	কার্ল মার্কস, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, উৎপাদন পদ্ধতি, শ্রেণি সংগ্রাম, উদ্বৃত্ত মূল্য, বিচ্ছিন্নতাবোধ।

কার্ল মাকর্সের জীবন ও কর্ম

কার্ল মার্কস ১৮১৮ সালে জার্মানীর ট্রায়ার শহরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি তাঁর পিতার নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ১৮৪১ সালে জেনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৮৪৩ থেকে ১৮৪৫ সাল পর্যন্ত প্যারিসে তিনি সমাজতান্ত্রিক চিন্তাবিদগণের সাথে পরিচিত হন। কার্ল মার্কস তাঁর প্রিয় বন্ধু এঙ্গেলস্ এর সাথে দীর্ঘ ৪০ বছরকাল অতিবাহিত করেন। ১৮৮৩ সালে তিনি মারা যান। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলি হলো The German Ideology, The Communist Manifesto, A Contribution to the Critique of Political Economy, Das Capital প্রভৃতি। কার্ল মার্কস হেগেলের দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হন। তিনি হেগেলের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি গ্রহণ করলেও ভাববাদের পরিবর্তে বস্তুবাদের চর্চা করেন। মার্কস ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, উৎপাদন পদ্ধতি, শ্রেণি সংগ্রাম, বিচ্ছিন্নতাবোধ প্রভৃতি তত্ত্ব প্রদানের মাধ্যমে সমাজবিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছেন।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (Historical Materialism)

কার্ল মার্কসের গুরু ছিলেন হেগেল। হেগেল ছিলেন ভাববাদী দার্শনিক (Idealistic Philosopher)। ভাববাদে বিশ্বাস করা হয় যে, বস্তু মূখ্য নয় বরং তার সম্পর্কে যে ভাবধারা সৃষ্টি হয় সেটাই মুখ্য। হেগেলের সঙ্গে মার্কসের এ বিষয়ে মতভেদ ছিল। কারণ মার্কস ছিলেন বস্তুবাদী। তাঁর কাছে বস্তুই মুখ্য। তিনি মনে করেন বস্তুই প্রথম, বস্তুকে কেন্দ্র করেই ভাবের সৃষ্টি। বিংশ শতাব্দীতে সমাজ ভাবনা মার্কসীয় চিন্তা-ভাবনা দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত। ঐতিহাসিক দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মাধ্যমে সমাজ বিশ্লেষণের নতুন দিগন্ত তৈরি হয়।

কার্ল মার্কস সমাজকে বস্তু হিসেবে গণ্য করে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন তাকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ (Dialectical Materialism) বলে। অন্যদিকে সমাজ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তিনি ঐতিহাসিক বিবর্তনের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও তিনি দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির প্রয়োগ করেছেন। মার্কসের সমাজ বিশ্লেষণের এ মতবাদকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (Historical Materialism) বলে অভিহিত করা হয়। দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে দুই পক্ষের মধ্যে আবশ্যিকভাবে সবসময় দ্বন্দ্ব বিরাজ করে। এ দ্বন্দ্ব দুই প্রকারের হতে পারে। যথা: (ক) ইতিবাচক (Positive) দ্বন্দ্ব এবং (খ) নেতিবাচক (Negative) দ্বন্দ্ব। ইতিবাচক দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় বিশ্লেষণের মাধ্যমে জগৎ সত্ত্বার যথার্থ স্বরূপ নিরূপণ করা হয়। আর নেতিবাচক দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় সংশ্লেষের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের মতবাদ খন্ডন করা হয়।

কার্ল মার্কস হেগেলের নিকট থেকে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি তা গ্রহণ করেন। দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন উৎপাদন ব্যবস্থায় বিপরীতমুখী দু'টি শক্তি থাকে। এর একটি ইতিবাচক (Thesis) এবং অন্যটি নেতিবাচক (Anti-thesis) শক্তি। উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব হয়ে একসময় নতুন শক্তি বা ব্যবস্থার (Synthesis) উদ্ভব ঘটে। এটা থেমে থাকে না বরং অব্যাহত থাকে। এভাবেই নতুন নতুন সমাজ ও উৎপাদন ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। বিষয়টি নিম্নের চিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো:

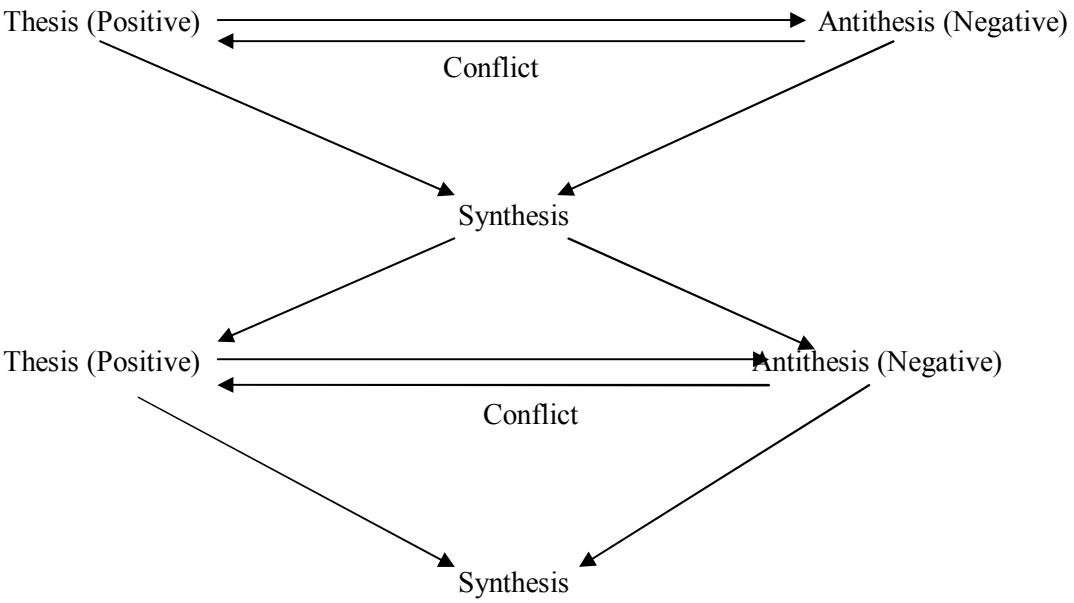

চিত্র ৩.২: শ্রেণি-দ্বন্দ্ব ও নতুন উৎপাদন ব্যবস্থা

কার্ল মার্কসের মতে, সমাজ একটি বস্তু। বস্তুর মধ্যে দ্বন্দ্বের ফলেই বস্তু বিকশিত হয়। তেমনি সমাজ বিকাশের ক্ষেত্রেও বস্তুবাদী দ্বন্দ্ব ক্রিয়াশীল। সমাজের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, পরিবর্তন, বিবর্তন এসবের পেছনে কোন কারণ বা সূত্র কাজ করে তা ঐতিহাসিক বস্তুবাদে জানা সম্ভব। তাই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে সমাজ বিকাশের সূত্র আবিষ্কারের প্রক্রিয়াকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (Historical Materialism) বলে। বস্তুর কতিপয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা সমাজ বিকাশেও লক্ষ করা যায়। যেমন:

প্রথমত : বস্তু কখনো স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করতে পারে না, এরা পরস্পর নির্ভরশীল;
দ্বিতীয়ত : সব বস্তুই গতিশীল, কোনটা দেখা যায়, কোনটা দেখা যায় না;
তৃতীয়ত : সব বস্তুই উর্ধ্বমুখী এবং ক্রমান্বয়ে বিকাশমান;
চতুর্থত : পরস্পর বিরোধী দ্বিবিধ শক্তি প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই রয়েছে, এ জন্য বস্তু পরিবর্তিত হয়;
পঞ্চমত : বস্তু প্রতিনিয়ত উৎকর্ষের দিকে এবং পরিমাণগত থেকে গুণগত দিকে পরিবর্তিত হয়;
ষষ্ঠত : বস্তুর অস্তিত্ব মনের উপর নির্ভরশীল নয় বরং মনের অস্তিত্ব বস্তুর উপর নির্ভরশীল।

বস্তুর উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ সমাজের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূল বক্তব্য হচ্ছে, সামাজিক পরিবর্তন বা রাজনৈতিক বিপ্লব কখনো মানুষের ধীশক্তিপ্রসুত দর্শন দ্বারা সংঘটিত হয় না। সামাজিক পরিবর্তনের মূলে রয়েছে উৎপাদন পদ্ধতি এবং এর মধ্যকার দ্বন্দ্ব। এ শক্তি দ্বারাই সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন, চিন্তা জগৎ সবকিছু নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত হয়।

উৎপাদন পদ্ধতি (Mode of Production)

সাধারণভাবে উৎপাদন পদ্ধতি হচ্ছে উৎপাদন সম্পর্ক এবং উৎপাদন শক্তিসমূহের সন্ধিযুক্ত (articulated) সম্মিলন, যার মধ্যে উৎপাদন সম্পর্ক প্রধান। উৎপাদন সম্পর্ক হচ্ছে উদ্বৃত্ত শ্রম সুনির্দিষ্টভাবে উপযোজনের এবং তার সাথে সঙ্গতি রেখে উৎপাদনের যে সুনির্দিষ্ট বিতরণ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে তার পতিফলন। মার্কসের মতে উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে সংঘাতের ফলে বিপ্লবের সৃষ্টি হয় এবং সমাজ পরিবর্তিত হয়। উৎপাদন শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে প্রথম দিকে যে ভারসাম্যতা দেখা যায় পরবর্তীতে তা বজায় থাকে না। ফলে দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে ওঠে। উৎপাদন পদ্ধতি হলো সমাজের মৌল কাঠামো (Basic Structure) যা সমাজের উপরি কাঠামোকে (Super Structure) প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রণ করে। তিনি পাঁচ ধরনের উৎপাদন পদ্ধতির ধারণা প্রদান করেন:

(১) আদিম সাম্যবাদী উৎপাদন পদ্ধতি (Mode of Production of Primitive Communism)
(২) দাস উৎপাদন পদ্ধতি (The Slave Mode of Production)

(৩) সামন্তবাদী উৎপাদন পদ্ধতি (The Feudal Mode of Production)
(৪) পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি (The Capitalist Mode of Production)
(৫) সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি (The Socialistic Mode of Production)

(১) **আদিম সাম্যবাদী উৎপাদন পদ্ধতি :** আদিম সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থার উৎপাদন শক্তি তথা উৎপাদনের উপকরণ ধীর গতিসম্পন্ন হলেও ক্রমান্বয়ে তার অগ্রগতি সাধিত হয়। হাতিয়ারের উন্নতি সাধিত হয়। উৎপাদনের উপকরণের মধ্যে কাঠ, পাথরের অস্ত্র, তীর-ধনুক উল্লেখযোগ্য। আর উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে সমতাভিত্তিক ভারসাম্যের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। কারণ সে সময় জটিল শ্রমবিভাজন ছিল না। সবাই সবাইকে সহযোগিতা করত। পরবর্তীতে জনসংখ্যার বৃদ্ধি, কৃষির বিকাশ, সমাজে স্তরভেদ তৈরির মাধ্যমে শোষণ প্রক্রিয়া শুরু হতে থাকে। উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন হয়ে নতুন ব্যবস্থার তথা শ্রেণি শোষণমূলক ব্যবস্থা তথা দাস ও দাসমালিকের উদ্ভব হয়।
(২) **দাস উৎপাদন পদ্ধতি :** আদিম সমাজের তুলনায় দাস সমাজ ব্যাবস্থায় উৎপাদনের উপকরণ আরো বেশি উন্নত হয়। উৎপাদন শক্তির উন্নতির ফলে উৎপাদনে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। এ সময়ে উৎপাদনের উপকরণের মধ্যে কাঠের লাঙ্গল ব্যবহারে দাসদের দক্ষতা গুরুত্বপূর্ণ। অপর পক্ষে উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে ছিল দাস আর দাসমালিক। দাসভিত্তিক উৎপাদন পদ্ধতিতে দাসদের কোনো অধিকার ছিল না। তাদের জীবন ধারণের জন্য নূন্যতম যা প্রয়োজন কেবলমাত্র তাই পেত। দাসরা অন্যের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হতো। তারা শোষণ নির্যাতনের শিকার হতো। অধিকার বঞ্চিত ও শোষণ নির্যাতনের কারণে উৎপাদন উপকরণ ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা যায়। পরবর্তীতে দাস বিদ্রোহের মাধ্যমে দাস উৎপাদন ব্যবস্থার পতন হয়; যার ফলে গড়ে ওঠে সামন্ততন্ত্র ব্যবস্থা।
(৩) **সামন্তবাদী উৎপাদন পদ্ধতি :** সামন্তবাদী উৎপাদন পদ্ধতিতে উৎপাদনের উপকরণ ছিল ভূমি, মানব শ্রম, গরু ঘোড়ার লাঙ্গল প্রভৃতি। উৎপাদন সম্পর্ক ছিল সামন্ত প্রভু এবং ভূমিদাস। ভূমিদাসগণ দাসদের চেয়ে কিছুটা বেশি অধিকার ভোগ করত। তারা ভূমির সঙ্গে বাধা ছিল। তবে দাস সমাজের মতো সামন্তসমাজও ছিল প্রভুত্ব ও নির্মম শোষণের যুগ। পরবর্তীতে শোষণ বঞ্চণার হাত থেকে মুক্তির প্রত্যাশায় এক নতুন সমাজব্যবস্থার সৃষ্টি হয় যেখানে মুক্ত শ্রম (Free Labour) লক্ষ করা যায়।
(৪) **পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি:** পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় উৎপাদন হয় ব্যক্তিগত মালিকানায় এবং অধিক মুনাফা লাভের আশায়। এখানে ভূমির পরিবর্তে কল-কারখানায় অধিক উৎপাদন হয়ে থাকে। পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতিতে উৎপাদনের উপায় হলো শিল্প কলকারখানা, শ্রম প্রযুক্তি, মানবদক্ষতা প্রভৃতি। উৎপাদন সম্পর্ক হলো শিল্প মালিক এবং শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে। কার্ল মার্কস পুঁজিবাদী সমাজে দু'টি শ্রেণির কথা বলেছেন। তা হলো বুর্জোয়া (Bourgeois) এবং সর্বহারা (Proletariate)। মার্কসের ধারণা পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা তথা উৎপাদন পদ্ধতিতে পুঁজিপতি এবং শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে দ্বন্দ্বের ফলে পুঁজিবাদের পতন হবে এবং নতুন সমাজ ব্যবস্থার জন্ম হবে যেখানে কোন শ্রেণি শোষণ ও বৈষম্য থাকবে না।
(৫) **সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি :** এ ধরনের সমাজব্যবস্থা শ্রেণি শোষণ ও বৈষম্যহীন। ফলে কোন রূপ দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয় না। রাষ্ট্র সকল কিছুর দেখভাল করে। ব্যক্তি তার সাধ্য অনুযায়ী পরিশ্রম করে এবং সে অনুযায়ী মূল্য রাষ্ট্র থেকে লাভ করে থাকে। সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণ থাকে কলকারখানা, ভূমি, রেলওয়ে প্রভৃতি। উৎপাদনের উপকরণের উন্নতি সাধনের মাধ্যমে বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা রাষ্ট্রের লক্ষ্য।
উৎপাদন পদ্ধতির বিভিন্ন পর্যায় বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিভিন্ন সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ সম্ভবপর হয়। তাছাড়া উৎপাদন শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্ক এর তাৎপর্য অনুধাবন সম্ভব যা সমাজবিকাশের পর্যায় সম্পর্কে জ্ঞান লাভে সহায়ক।

শ্রেণি সংগ্রাম (Class Struggle)

মার্কসীয় তত্ত্বের অন্যতম বিষয় হচ্ছে শ্রেণি সংগ্রাম। ইতিহাসের প্রতিটি পর্যায়ে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রেণিগত অবস্থান ও দ্বন্দ্ব তৈরি হয় যার প্রেক্ষিতে সমাজ পরিবর্তিত হয়। শ্রেণি সম্পর্কে মার্কস সুনির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা প্রদান করেননি। তবে তিনি যে ধারণা দিয়েছেন তা হলো শ্রেণি বলতে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যারা একই ধরনের কাজে নিয়োজিত তাদের প্রত্যেকেই শ্রেণির সদস্য। অন্যদিকে সংগ্রাম বলতে অধিকার আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন করে যাওয়াকে বোঝানো হয়। তাই বলা হয়, শ্রেণি সচেতন মানুষ তাদের শোষণ নির্যাতনের হাত থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে অধিকার আদায় না হওয়া পর্যন্ত যখন আন্দেলন করতে থাকে তখন তাকে শ্রেণি সংগ্রাম বলে। শ্রেণিসংগ্রাম সম্পর্কে মার্কস বলেন, মানব সমাজের ইতিহাস শ্রেণি সংগ্রামের ইতহাস (The history of all hitherto existing society is the history of class struggles)। তাঁর মতে প্রতিটি

সমাজেই উৎপাদন যন্ত্রের উপর ভিত্তি করে পরস্পর বিরোধী দুটি শ্রেণি থাকে যারা সংগ্রামে লিপ্ত থাকে। শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি শিল্প বিপ্লবের পর থেকে আধুনিক সমাজ পর্যন্ত স্পষ্টত দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত বলে জানিয়েছেন। তা হলো (ক) বুর্জোয়া (Bourgeois) এবং (খ) সর্বহারা (Proletariate)। সহজভাবে বলা হয় যারা উৎপাদনের উপকরণ নিয়ন্ত্রণ করে তারা বুর্জোয়া আর যাদের কায়িক শ্রম ছাড়া আর কিছুই নাই তারা সর্বহারা। সমাজের যে পরিবর্তন তথা বিকাশ ঘটেছে তা শ্রেণি সংগ্রামেরই ফল।

কার্ল মার্কস শ্রেণিসংগ্রাম সম্পর্কিত আলোচনায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়ের কথা বলেছেন। তা হলো বাস্তব শ্রেণি (Class in itself) এবং সচেতন শ্রেণি (Class for itself). যখন কেবল উৎপাদন সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে যে শ্রেণি গড়ে ওঠে তা হচ্ছে বাস্তব শ্রেণি। এদের মধ্যে কম সচেতনতা লক্ষ করা যায়। অপর পক্ষে সচেতন শ্রেণি হলো অধিকার আদায় ও প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সচেতনতা থাকে, প্রয়োজনে আন্দোলন করে। মার্কসের মতে, শ্রমিকরা শোষণের শিকার হলে দাবি আদায়ে সোচ্চার হয়। তখনই দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম অনিবার্য হয়ে পড়ে। এভাবেই মার্কস তার শ্রেণি সংগ্রাম তত্ত্ব দিয়ে মানব সমাজের বিকাশ ধারাকে বিশ্লেষণ করেছেন।

বিচ্ছিন্নতাবোধ (Theory of Alienation)

বিচ্ছিন্নতাবোধ সমাজবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়। প্রাশ্চাত্যের অনেক দার্শনিকই বিচ্ছিন্নতাবোধ প্রত্যয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। বিচ্ছিন্নতাবোধ প্রত্যয়টি হেগেল এবং মার্কসের মাধ্যমে দর্শন হতে সমাজবিজ্ঞানে ব্যবহৃত হয়। ইতিপূর্বে প্রত্যয়টিকে মানসিক ধারণা হিসেবে গ্রহণ করা হতো। মার্কস বিচ্ছিন্নতাবোধকে মনস্তত্ত্বের পরিবর্তে বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পান। তাঁর মতে, বিচ্ছিন্নতাবোধ কোনো মনস্তাত্ত্বিক বিষয় নয়। এটা সামাজিক বিষয়। মার্কস মনে করেন, পুঁজিবাদী সমাজে বিচ্ছিন্নতাবোধ দেখা যায়। পুঁজিবাদ বিকাশের সাথে সাথেই বিচ্ছিন্নতাবোধ বাড়তে থাকে। সমাজের একটা বিশেষ শ্রেণি এই বিচ্ছিন্তাবোধ দ্বারা আক্রান্ত হয়। বিচ্ছিন্নতাবোধের সঙ্গে শ্রমিক তথা শ্রমের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় বলে মার্কস এ তত্ত্বের নাম দেন শ্রমের বিচ্ছিন্নতাবাধের তত্ত্ব (Theory of Alienated Labour)। মূলত পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা থেকেই বিচ্ছিন্নতাবোধ এর সৃষ্টি হয়। পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিক শ্রেণি উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে সমাজ থেকে নিজেকে আলাদা ভাবতে শুরু করে যা বিচ্ছিন্নতাবোধের জন্ম দেয়।

বিভিন্ন কারণে বিচ্ছিন্নতাবোধ হয়ে থাকে। পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিক তার নিজের শ্রমের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারছে না। কারণ উৎপাদন উপকরণসমূহের মধ্যে একমাত্র শ্রম ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর উপর তার নিয়ন্ত্রণ নেই। তাছাড়া জটিল শ্রমবিভাজন এ বিচ্ছিন্নতাবোধকে আরো প্রকট করছে। শ্রমিক শ্রেণি কর্মহীনতার কারণেও বিচ্ছিন্নতাবোধ করে । শ্রমিক শ্রেণি ক্ষমতাহীনতার কারণেও বিচ্ছিন্নতাবোধ করে। ফলে তিনটি স্থানে বিচ্ছিন্নতাবোধ করে। প্রথমত: শ্রমিক তার উৎপাদিত পণ্য হতে বিচ্ছিন্নতাবোধ করে, দ্বিতীয়ত: শ্রমিক তার উৎপাদনের উপকরণ হতে বিচ্ছিন্নতাবোধ করে এবং তৃতীয়ত: শ্রমিক তার দল বা সমাজ হতে বিচ্ছিন্নতাবোধ করে। ফলস্বরূপ সে তার সমষ্টিবদ্ধতা (Collectivity) হারিয়ে ফেলে। শ্রমের বিচ্ছিন্নতাবোধ তত্ত্ব দ্বারা আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার ত্রুটিপূর্ণ দিকসমূহ অনুধাবনে সহায়ক।

উদ্বৃত্ত মূল্য (Surplus Value)

কার্ল মার্কস তার উদ্বৃত্ত মূল্য ধারণার সাহায্যে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় শোষণের প্রকৃতি তুলে ধরেছেন। উৎপাদনে অবদানের মাধ্যমে শ্রমিক নির্দিষ্ট মজুরির অতিরিক্ত যে মূল্য সৃষ্টি করে তাকে উদ্বৃক্ত মূল্য বলা হয়। একজন শ্রমিকের কাজের সময় দুইভাগে ভাগ করা হয়। আবশ্যকীয় শ্রম সময় (Required Labour Hours) এবং উদ্বৃক্ত শ্রম সময় (Surplus Labour Hours)। শ্রম শক্তির মূল্য আবশ্যিক শ্রম সময়ে উৎপাদিত মূল্য নির্দেশ করে। তাই মোট শ্রম সময় থেকে আবশ্যক শ্রম সময় বাদ দিলে উদ্বৃক্ত শ্রম সময় পাওয়া যায়। এই উদ্বৃক্ত শ্রম সময়ে একজন শ্রমিক যে মূল্য সৃষ্টি করে তাই হলো উদ্বৃক্ত মূল্য। অর্থাৎ শ্রমিক কর্তৃক উৎপাদিত মূল্য এবং তার মজুরীর যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় তাকে মার্কস উদ্বৃক্ত মূল্য (Surplus Value) বলেছেন। অনেকে পুঁজিপতির এ মুনাফাকেই উদ্বৃক্ত মূল্য হিসেবে বিবেচনা করেন। একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি পরিষ্কার করা যেতে পারে। ধরা যাক একজন শ্রমিক একদিনে মোট ০৮ ঘন্টা কাজ করে। শ্রমিক ০৮ ঘন্টা কাজ করে যে পণ্য উৎপাদন করে তার মূল্য যদি ধরা যাক ১২০০ (এক হাজার দুইশত) টাকা। এই ১২০০ টাকার পণ্য-মূল্যে শ্রমিকের শ্রম ছাড়াও ব্যবহৃত কাঁচামালের মূল্য, যন্ত্রপাতি বাবদ ব্যয় ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকে। মনে করি, ১২০০ টাকার পণ্য উৎপাদনে শ্রমিকের শ্রম ব্যতীত আরো ৪০০ টাকা খরচ (বিনিয়োগ) করা হয়। সুতরাং

১২০০ টাকার পণ্য উৎপাদনে শ্রমিকের অবদান (১২০০-৪০০) = ৮০০ টাকা। এখন দৈনিক ০৮ ঘন্টা পরিশ্রম করে পুঁজিপতি যদি শ্রমিককে ৪০০ টাকা প্রদান করেন, তবে এ ক্ষেত্রে পুঁজিপতির মুনাফা দাড়ায় (৮০০-৪০০) = ৪০০ টাকা। পুঁজিপতিদের এই মুনাফাই হলো উদ্বৃক্ত মূল্য; যা মূলত শ্রমিকের শ্রম থেকে অর্জিত।

শিক্ষার্থীর কাজ	কার্ল মার্কসের শ্রেণি সংগ্রাম তত্ত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো লিখুন।	**সময় : ১০ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

কার্ল মার্কস কেবল যুগ-শ্রেষ্ঠ সমাজতাত্ত্বিক নয়, প্রভাবশালী অর্থনীতিবিদ এবং দার্শনিক। তিনি আধুনিক বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের জনক। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, শ্রেণি সংগ্রাম তত্ত্ব, উৎপাদন পদ্ধতি, উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব, পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার বিচ্ছিন্নতাবোধ প্রভৃতি তাঁর কালোত্তীর্ণ মতবাদ। দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে তিনি সমাজকে বস্তুর আলোকে অধ্যয়ন করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন তাঁর ঐতিহাসিক বস্তুবাদে। তাঁর মতে উৎপাদন পদ্ধতি সমাজের চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। শ্রেণি সচেনতা সম্পর্কিত ধারণা শ্রেণি সংগ্রাম তত্ত্বে পাওয়া যায়। বিচ্ছিন্নতাবোধের মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণির বঞ্চিত হওয়ার পরও সমাজে অবস্থানের ধারণা পাওয়া যায়। তাঁর মতে পুঁজিপতি শ্রেণি শ্রমিকের উদ্বৃত্তমূল্য শোষণ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সামন্তবাদী উৎপাদন পদ্ধতিতে উৎপাদন সম্পর্ক কেমন?

(ক) ভূমিদাস-ভূস্বামী (খ) দাস-দাস মালিক

(গ) মালিক-শ্রমিক (ঘ) বুর্জোয়া-প্রলিতারিয়েত

২। বিচ্ছিন্নতাবোধের ফলে শ্রমিকের অবস্থা কী হয়?

(ক) আত্মীয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয় (খ) উৎপাদিত পন্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়

(গ) বন্ধু থেকে বিচ্ছিন্ন হয় (ঘ) রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়

পাঠ-৩.৭ ম্যাক্স ওয়েবার
Max Weber

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- ম্যাক্স ওয়েবারের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- আদর্শ নুমুনা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যাবলী বর্ণনা করতে পারবেন;
- ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন এবং
- পুঁজিবাদ বিকাশে প্রোটেস্ট্যান্ট নীতিমালার ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ম্যাক্স ওয়েবার, আদর্শ নমুনা, আমলাতন্ত্র, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, পুঁজিবাদ, প্রোটেস্ট্যান্ট নীতিমালা।

ম্যাক্স ওয়েবারের জীবন ও কর্ম

ম্যাক্স ওয়েবার ১৮৬৪ সালে জার্মানীর ইরফুর্ট শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাল্যকালের অধিকাংশ সময় কাটে বার্লিনে। তিনি আইন ও অর্থনীতি বিষয়ে লেখা পড়া করেন। তাঁর প্রধান আগ্রহের বিষয় ছিল ইতিহাস, অর্থনীতি, এবং সমাজবিজ্ঞান। চিন্তাধারায় সূক্ষ্মতা ও বিশ্লেষণাত্বক বাস্তবতার জন্য অপরাপর চিন্তাবিদদের তুলনায় তিনি ছিলেন স্বতন্ত্র। ওয়েবারের সমাজবিজ্ঞানের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো সামাজিক ক্রিয়া (Social Action)। ম্যাক্স ওয়েবারের রচনাবলির মধ্যে General Economic History, The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism এবং Economy and Society উল্লেখযোগ্য। ১৯২০ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

পদ্ধতিতত্ত্ব (Methodology)

ম্যাক্স ওয়েবার সমাজবিজ্ঞানের নিজস্ব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি মনে করতেন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় ব্যবহার করলে তা বহুলাংশে ব্যর্থ হবার সম্ভবনা রয়েছে। তাই সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার সফলতার জন্য সমাজকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা উচিত। ওয়েবার সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়নে ব্যাখ্যামূলক (interpretive) এবং সর্বাত্মক (comprehensive) পদ্ধতিকে অধিকতর কার্যকর বলে মনে করতেন। ব্যাখ্যামূলক পদ্ধতির সফল প্রয়োগের মাধ্যমে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনার গুরুত্ব তুলে ধরেন। আর সর্বাত্মক পদ্ধতির সাহায্যে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা যেকোনো সামাজিক ঘটনার কার্যকারণ ব্যাখ্যা করা হয়।

আদর্শ নমুনা (Ideal Type)

সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় আদর্শ নমুনা ওয়েবারের আলোচ্য বিষয়সমূহের মধ্যে অন্যতম। আদর্শ নমুনা হলো কোনো বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটি মানসিক চিত্র যার মাধ্যমে ঐ বিষয়বস্তুর বাস্তব দিকগুলো মূর্তমান হয়ে ওঠে। তিনি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে আদর্শ নমুনার প্রয়োগ করেছেন। আদর্শ নমুনা প্রসঙ্গে Timasheff বলেন, আদর্শ নমুনা হলো একটি মানসিক চিত্র যা বাস্তবতার নিরিখে পর্যবেক্ষণযোগ্য প্রলক্ষণসমূহকে সুস্পষ্ট করে। Coser এর মতে, আদর্শ নমুনা মূর্ত ঘটনাবলির সাদৃশ্য বা বিচ্যুতি অনুসন্ধানের জন্য বিশ্লেষণধর্মী পরিমাপক হিসেবে অনুসন্ধানকারীকে সাহায্য করে। (An ideal type is an analytical construct that serves the investigator as a meausing rod to ascertain similarities as well as deviations in concreate cases)।

আদর্শ নমুনার কতিপয় বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। যেমন- ক) আদর্শ নমুনা হলো একটি মানসিক চিত্র, খ) আদর্শ নমুনা কোনো অনুসিদ্ধান্ত নয়, গ) আদর্শ নমুনা নৈতিক আদর্শ বিষয়ে আলোচনা করে না, ঘ) এটি পরিসংখ্যানিক গড় নয়, ঙ) এটি বাস্তবতা অনুসন্ধানে তাত্ত্বিক টুলস্ হিসেবে কাজ করে, চ) এটি স্থির বা নিশ্চল নয় বরং পরিবর্তিত হয় এবং ঝ) এটি তুলনামূলক বিশ্লেষণে সাহায্য করে।

আমলাতন্ত্র (Bureaucracy)

আমলাতন্ত্র একটি সার্বজনীন ধারণা। বিশ্বের সকল স্থানে আমলাতন্ত্র পরিলক্ষিত হয়। সরকারি, বেসরকারি, এমনকি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানেও আমলাতন্ত্র বিদ্যমান। আমলাতন্ত্রে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম রয়েছে যা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে পূর্ণতা পায় নিয়োগ প্রাপ্তি এবং নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে। ম্যাক্স ওয়েবার 'আমলাতন্ত্র' (Bureaucracy) প্রত্যয়টির প্রবর্তন করেন।

আমলাতন্ত্র সম্পর্কে Coser বলেন, আমলাতন্ত্র যৌক্তিক নীতি দ্বারা পরিচালিত অফিসসমূহ পদ সোপানক্রম দ্বারা নির্দিষ্ট এবং তাদের কার্যক্রম পরিচালিত হয় নৈর্ব্যক্তিক নীতির ভিত্তিতে। (Bureaucracies are organized according to rational principles. Offices are ranked in a hierarchical order and their operations are characterized by impersonal rules)।

Aron এর মতে, ওয়েবারের দৃষ্টিতে আমলাতন্ত্র হলো বিভিন্ন কাঠামোগত প্রলক্ষণ। এটি একটি স্থায়ী সংগঠন যেখানে বিভিন্ন ব্যক্তির সহযোগিতায় গড়ে ওঠে যা বিশেষ ক্রিয়া সম্পাদন করে। (Bureaucracy in the weberian sense is defined by several structural traits. It is a permanent organization involving cooperation among many individuals each of whom performs specialized functions)।

ওয়েবারের মতে আমলাতন্ত্র কেবলমাত্র আধুনিক রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রেই নয় বরং প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থাতেও এ সংগঠনের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। যেসব কারণে আমলাতন্ত্রের বিকাশ ঘটে তার মধ্যে মুদ্রাভিত্তিক অর্থব্যবস্থার প্রচলন, প্রযুক্তিগত বিপ্লব, কল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং সুশাসন ব্যবস্থার বিস্তার উল্লেখযোগ্য। ওয়েবার তাঁর আদর্শ নমুনার আলোকে আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেন। এগুলো হচ্ছে:

১। আমলাতান্ত্রিক সংগঠনে অফিসিয়াল কার্যক্রম সুনির্দিষ্ট নিয়ম দ্বারা প্রতিষ্ঠিত;
২। অফিসের প্রত্যেকের ক্ষমতা ও কর্তব্য সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়;
৩। এ ধরনের সংগঠনে পদসোপানক্রম থাকে যেখানে নিচের পদের ব্যক্তি উপরের পদের নিকট জবাবদিহি থাকে;
৪। দক্ষতার ভিত্তিতে নিয়োগ ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ পায় এবং স্বাধীনভাবে নিয়ম অনুযায়ী কাজ করে;
৫। অধীনস্থ কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণ করার সার্বিক কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা উর্ধতন কর্মচারীদের হাতে ন্যাস্ত করার ব্যবস্থা আছে;
৬। কর্মজীবনে ব্যক্তি কতটুকু সফল তার উপর ভিত্তি করে পদোন্নতি হবে;
৭। অফিসের যাবতীয় কর্মকান্ডের লিখিতভাবে রেকর্ড থাকবে এবং তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে।

পরিশেষে বলা যায় যে, ম্যাক্স ওয়েবারের আদর্শ ধরনের আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে সমাজ সভ্যতার অগ্রগতি সম্ভব। তাছাড়া যেকোনো সমাজব্যবস্থার আমলাতন্ত্র অনুধাবনের জন্য ওয়েবার প্রদত্ত আমলাতন্ত্র মডেল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব (Power and Authority)

ম্যাক্স ওয়েবার সামাজিক স্তরবিন্যাসের একটি উপাদান হিসেবে ক্ষমতার উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, সমাজে একজন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যখন অন্য কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উপর তাঁর সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে পারে তখন তাকে ক্ষমতা বলে। ক্ষমতার ভিত্তি হিসেবে তিনি সম্পত্তি, শিক্ষা, রাজনৈতিক অবস্থান, প্রভাবশালীদের সঙ্গে সম্পর্ক প্রভৃতি উল্লেখ করেছেন।

সাধারণভাবে কর্তৃত্ব হলো ক্ষমতা ব্যবহার বা প্রয়োগ করার বৈধ অধিকার। ক্ষমতা ছাড়া কর্তৃত্বের ধারণা অর্থহীন। অর্থাৎ ক্ষমতা যখন বৈধ উপায়ে অর্জন করা হয় এবং বৈধ উপায়ে প্রয়োগ করা হয় তখন তা কর্তৃত্ব হিসেবে বিবেচিত হয়। কর্তৃত্ব হতে হলে তার বৈধতা প্রয়োজন। কর্তৃত্বের সংজ্ঞায় Mitchell বলেন, কতৃত্ব হচ্ছে ক্ষমতার সেই ধরন যা অন্যের উপর বৈধভাবে প্রভাব বিস্তার করে। (Authority is that form of power which orders or articulates the actions of other actors through commands which are effective because those who are commanded regard the commands as legitimate)।

কর্তৃত্বের প্রকারভেদ: ম্যাক্স ওয়েবার তিন ধরনের কর্তৃত্বের ধারণা দেন। তা হলো-
(ক) যৌক্তিক কর্তৃত্ব (Rational Authority)
(খ) ঐন্দ্রজালিক কর্তৃত্ব (Charismatic Authority) এবং
(গ) ঐতিহ্যগত কর্তৃত্ব (Traditional Authority)।

(ক) যৌক্তিক কর্তৃত্ব : যৌক্তিক কর্তৃত্বের ভিত্তি হলো আইন-কানুন। এখানে কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্য বলতে উচ্চ পদাধিকার ব্যক্তির প্রতি আনুগত্য বুঝায় না বরং আইনের প্রতি আনুগত্য বুঝায়। দেশের নির্বাহী কোনো ব্যক্তি যখন কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে তখন তা যৌক্তিক কর্তৃত্ব বলে পরিচিত। আধুনিক এবং শিল্পায়িত সমাজে এ ধরনের কর্তৃত্ব লক্ষ করা যায়।

(খ) ঐন্দ্রজালিক কর্তৃত্ব : ঐন্দ্রজালিক কর্তৃত্ব ব্যক্তির অসাধারণ ব্যক্তিগত গুণাবলী, আবেগ আপ্লুত মনোভঙ্গি, বীরত্ব ও স্বরণীয় চারিত্রিক বলিষ্ঠতার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ ধরনের নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রেখে আনুগত্য প্রকাশ করা হয়। অনুসারীগণ বিশ্বাস করেন যে, তাঁদের নেতা ভুল করতে পারে না এ ধরনের কর্তৃত্ব সব সমাজেই কম-বেশি লক্ষ করা যায়। এ ধরনের নেতৃত্বের গুণাবলী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, নেপোলিয়ন, মাওসেতুং, আব্রাহাম লিংকন, মহাত্মা গান্ধী, নেলসন ম্যান্ডেলা প্রমুখ নেতার মধ্যে লক্ষ করা যায়।

(গ) ঐতিহ্যগত কর্তৃত্ব : ঐতিহ্যগত কর্তৃত্ব বছরের পর বছর ধরে যে বিশ্বাস চলে আসে তার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। এ ধরনের কর্তৃত্বের উৎস হলো সনাতনী নিয়ম, রীতিনীতির প্রতি চিরায়ত বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা। কোনো ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর নেতা, সমাজপতি, গ্রামীণ জ্ঞাতিগোষ্ঠীর কেউ এ ধরনের নেতৃত্বের উদাহরণ হতে পারেন।

পুঁজিবাদ ও প্রোটেস্ট্যান্ট নীতিমালা (Capitalism and Protestrant Ethics)

ম্যাক্স ওয়েবারের চিন্তা শুরু হয়েছিল অর্থনৈতিক বিষয়কে কেন্দ্র করে। তাঁর অধ্যয়ন অর্থনীতি বিষয়ে শুরু হলেও শেষ করার আগেই ভিন্ন বিষয়ে মনোযোগী হন। তিনি মূলত জার্মান সমাজতাত্ত্বিক কার্ল মার্কস এর বিপরীতে একটি নতুন ধারণা প্রদান করেন। মার্কস যেখানে বলেন সমাজের মৌল কাঠামো (অর্থ ব্যবস্থা) উপরিকাঠামোকে প্রভাবিত করে সেখানে ওয়েবার বলেন যে, সমাজের উপরিকাঠামোর উপাদানও মৌল কাঠামোকে প্রভাবিত করতে পারে। তাঁর এই বক্তব্যের সমর্থনে দেখান যে, প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মের নীতিবোধ এবং বিধিবিধান কিভাবে পুঁজিবাদ বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। আধুনিক ইউরোপীয় পুঁজিবাদ বিকাশে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মীয় নীতিমালার প্রভাব প্রমাণ করাই ১৯০৪ সাল থেকে ১৯০৫ সালের মধ্যে প্রকাশিত তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* এর মূল কথা। খ্রিস্টধর্মের দুটি অংশ ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্ট্যান্ট। এর মধ্যে প্রোস্ট্যেন্টদের নীতিমালাসমূহ পুঁজিবাদ বিকাশে অনুকুল ছিল।

পুঁজিবাদ বলতে বুঝায় এমন এক বিশেষ ধরনের উৎপাদন ব্যবস্থা যেখানে উৎপাদনকারীর উদ্দেশ্য থাকে অধিক মুনাফা অর্জন করা উৎপাদনের বেশিরভাগ ভোগের জন্য ব্যয় না করে আরো বেশি উৎপাদনে বিনিয়োগ করা হয়। ওয়েবার একারণে পুঁজিবাদকে যৌক্তিক বলেছেন। তিনি পুঁজিবাদকে আদর্শ নমুনার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করেছেন। পুঁজিবাদের কতিপয় বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। তা হলো- উৎপাদন হয় ব্যক্তিগত মালিকানায়, মূল লক্ষ্য থাকে মুনাফা অর্জন, উৎপাদন হয় অর্থ লাভ ও বাজারজাতকরণের জন্য। পুঁজিবাদ একটি যৌক্তিক সংগঠন, পুঁজিবাদে মুক্ত শ্রম পরিলক্ষিত হয়। হিসাব করা হয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে। তাই বলা হয় পুঁজিবাদী সংগঠন এমন এক সংগঠন যার অর্থ অধিক মুনাফা অর্জন করা। যৌক্তিক কাজের এবং উৎপাদনের একটি ব্যবস্থাপনা যার মাধ্যমে যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

ষোড়শ শতকে মার্টিন লুথার কিং এবং জন ক্যালভিন যে সংস্কারের ধারণা দেন তা খ্রিস্টধর্মের প্রোটেস্ট্যান্ট অনুসারীগণের মধ্যে লক্ষ করা যায় এবং পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটায়। প্রোটেস্ট্যান্ট অনুসারীগণের কিছু নীতিমালা পুঁজিবাদ বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তা হলো সময়ই অর্থ (Time is Money), কর্মই ঈশ্বর (Work is God), সহজ সরল জীবন যাপন করা (Live an ascetic life) এবং নতুন বিনিয়োগই অর্থ (Credit is money)। যারা এ সকল নীতিমালায় বিশ্বাস করবে তারা ঈশ্বরের নৈকট্য লাভ করবে। এসব নীতিমালায় পুঁজিবাদের বিকাশ হয়েছিল বলে ওয়েবার মনে করেন।

মার্টিন লুথার কিং এবং জন ক্যালভিন প্রোটেস্ট্যান্ট নীতিমালার উল্লিখিত সংস্কার সাধন করেন। এসব নীতিমালা গ্রহণের মাধ্যমে প্রোটেস্ট্যান্ট অনুসারীগণ পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটায় বলে ওয়েবার মনে করেন। কিং ও ক্যালভিনের সংস্কারসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- ক) কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে সম্পদ লাভ করা সম্ভব, খ) মানুষকে আত্মত্যাগী হতে হবে, গ) উৎপাদনে আত্মনিয়োগ করতে হবে, ঘ) সুশৃঙ্খল জীবন যাপন করতে হবে, ঙ) সময়কে পবিত্র জ্ঞান করতে হবে, চ) মানুষকে কাজে নিষ্ঠাবান, সচেতন ও আত্মবিশ্বাসী হতে হবে, ছ) পুঁজি সঞ্চয় করতে হবে এবং জ) প্রত্যেক ব্যক্তি তার ইচ্ছেমত কাজ করবে এবং তার কাজের স্বীকৃতি দিতে হবে। ওয়েবারের মতে, এসব সংস্কারকে ধর্মীয় নীতিমালা হিসেবে গ্রহণ করায় প্রোটেস্ট্যান্টদের দ্বারা পুঁজিবাদের বিকাশ হয়েছিল।

	শিক্ষার্থীর কাজ	ওয়েবারের আমলাতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো লিখুন।	**সময় : ১০ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

সমাজতত্ত্বের অন্যতম পুরোধা হচ্ছেন ম্যাক্স ওয়েবার। তাঁর সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতির অনুশীলন, গবেষণা, অনুসন্ধান ও রচনাবলি সমাজবিজ্ঞান বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বিশেষ করে মার্কসের অর্থনৈতিক ধারণা বা মৌল কাঠামোর (Basic structure) বিপরীতে ওয়েবার উপরি কাঠামো যেমন সংস্কৃতি, ধর্ম প্রভৃতির প্রভাব ও গুরুত্ব তুলে ধরেছেন তথ্য, যুক্তি ও প্রমাণের ভিত্তিতে। মার্কস বলেছেন, মৌল কাঠামোই উপরি কাঠামোর নিয়ন্ত্রক। কিন্তু ওয়েবার দেখিয়েছেন, উপরি কাঠামো কিভাবে মৌল কাঠামোক প্রভাবিত করে। এ প্রসঙ্গে তিনি পুঁজিবাদ বিকাশে প্রোটেস্ট্যান্ট নীতিমালার অবদানকে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। ওয়েবারের আদর্শ নমুনা, আমলাতন্ত্র এবং ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়নের এক অমূল্য সম্পদ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ম্যাক্স ওয়েবারের সমাজতত্ত্বের প্রধান আলোচ্য বিষয় কী?

(ক) সামাজিক প্রগতি (খ) সামাজিক উন্নয়ন

(গ) আদর্শ নমুনা (ঘ) সামাজিক নিয়ন্ত্রণ

২। কোথায় পদসোপানক্রম থাকে?

(ক) পুঁজিবাদে (খ) আমলাতন্ত্রে

(গ) আদর্শ নমুনায় (ঘ) সামাজিক সমস্যায়

৩। যৌক্তিক কর্তৃত্ব কী দ্বারা পরিচালিত?

(ক) আইন (খ) আবেগ

(গ) রীতিনীতি (ঘ) ব্যক্তিগত গুণ

ইউনিট-৩ এর উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.১ ঃ ১। খ ২। গ ৩। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.২ ঃ ১। খ ২। গ ৩। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৩ ঃ ১। খ ২। গ ৩। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৪ ঃ ১। খ ২। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৫ ঃ ১। খ ২। ক ৩। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৬ ঃ ১। ক ২। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৭ ঃ ১। গ ২। খ ৩। ক

চূড়ান্ত মূল্যায়ন ঃ ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। গ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

১. মানুষের আবিষ্কৃত প্রথম বিজ্ঞান কোনটি?
ক) জ্যোতির্বিদ্যা খ) গণিত
গ) পদার্থবিদ্যা ঘ) সমাজবিজ্ঞান

২. যোদ্ধা সমাজের ধারণা কে প্রদান করেছেন?
ক) অগাস্ট কোঁৎ খ) হার্বার্ট স্পেন্সার
গ) এমিল ডুর্খেইম ঘ) কার্ল মার্কস

খ. বহুপদি সমাপ্তিসূচক বহুনির্ভাচনী প্রশ্ন

৩. সমাজবিজ্ঞানী নন-
i. অগাস্ট কোঁত
ii. আইনস্টাইন
iii. স্টিফেন হকিন্স
সঠিক উত্তর কোনটি?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪. ডুর্খেইমের সমাজতাত্ত্বিক অবদান হচ্ছে–
(i) শ্রমবিভাজন
(ii) সামাজিক ঘটনা
(iii) যৌথ প্রতিরূপ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i l ii খ. i l iii গ. i, ii, l iii ঘ. ii l iii

গ. সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্নঃ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন

শীলা খুলনা থেকে ঢাকায় তার মামার বাসায় বেড়াতে এসেছে। সে এ বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। ভর্তির প্রস্তুতিতে সহায়তা করতে মামা একদিন তাকে নিয়ে বসলেন। মামা খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন, শীলা উচ্চ মাধ্যমিকে সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়ন করেছে এবং এটি তার একটি পছন্দের বিষয়। অতঃপর মামা তাকে প্রশ্ন করলেন; ক) কে কত সালে সমাজবিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রবর্তন করেছেন? খ) প্রখ্যাত একজন মুসলিম সমাজচিন্তাবিদের নাম কী? গ) কোন্ সমাজতাত্ত্বিক সমাজকে জীবদেহের সাথে তুলনা করেছেন? ঘ) কোন সমাজবিজ্ঞানী আত্মহত্যা এবং সামাজিক সংহতি বিষয়ে তত্ত্ব প্রদান করেছেন? ঙ) বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের জনক কে? চ) কোন সমাজবিজ্ঞানীকে আমলাতন্ত্রের জনক বলা হয়? ইত্যাদি। শীলা অধিকাংশ প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পেরেছিল। অতঃপর মামা তাকে সুযোগ পেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে ভর্তির পরামর্শ প্রদান করেন।

(ক) ইবনে খালদুন কবে কোথায় জন্মগ্রহণ এবং মৃত্যুবরণ করেন? ১
(খ) ত্রয়স্তর সূত্রের প্রধান স্তরগুলো কী কী? ২
(গ) পুঁজিবাদী সমাজে কীভাবে শ্রেণি সংগ্রাম হয়? ৩
(ঘ) ওয়েবারের আদর্শ নমুনার ভিত্তিতে আমলাতন্ত্র ব্যাখ্যা করুন। ৪